তিমির-তীর্থ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫১
দ্বিতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৫৫
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রিট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—গিরীন্দ্রনাথ সিংহ
দি প্রিন্টিং হাউস
৭০, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
দু' টাকা বারো আনা

কথাশিল্পী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সুহৃত্তমেষু

'তিমির-তীর্থ' লিখেছিলাম ছাত্র-জীবনে, প্রায় পাঁচ বছর আগে। নানা কারণে লেখাটি এতদিন তিমিরেই নিহিত হয়ে ছিল। কবিবন্ধু গোপাল ভৌমিক লেখাটিকে উদ্ধার করে 'শারদীয়া দৈনিক কৃষক' (১৩৫১)-এ পত্রস্থ করেন এবং শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী মনোজ বসু এই যুদ্ধের দুর্মূল্যতার বাজারেও বইটিকে শোভন ও সুন্দর করে প্রকাশিত করবার দায়িত্ব নেন। এঁদের দু' জনের কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞতার ঋণে আমি বন্দী।

বইটির নামকরণের জন্যে শ্রদ্ধাস্পদ সজনীকান্ত দাসের কাছে আমি ঋণী। পরিশেষে বক্তব্য এই, বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিল আছে বলেই একে কোনো বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গেলে আমার ওপরে অবিচার করা হবে।

জলপাইগুড়ি

২৫শে অগ্রহায়ণ

১৩৫১

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চক্রবাল

আশ্বিন মাসেই এবার বড় নদীর উপর দিয়া কুয়াশা নামিতে সুরু হইয়াছে। এ অঞ্চলে এমনটা বড় দেখা যায়না, তবু ইহার মধ্যেই বাতাসে শীতের আমেজ লাগিতেছে একটু একটু করিয়া। সকালে ঘুম ভাঙিয়া জানালা দিয়া শিশির-ভেজা মাঠের দিকে চাহিলে মনে হয়, কেমন একটা ঝাপসা আচ্ছন্নতায় শিশির-সিক্ত পৃথিবীটা ডুবিয়া আছে। প্রথম রাত্রে বাতাস বন্ধ হইয়া অসহ্য গরমে ছটফট করিতে হইলেও অন্ধকারের রঙ ফিকে হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা শিরশিরে ঠাণ্ডায় ঘর ভারি হইয়া ওঠে—কাপড়খানাকে ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া নিতে হয়। শেফালির মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে শিশিরের মাটি-মিশ্রিত গন্ধও ভাসিয়া আসে।

আড়িয়ল খাঁ বর্ষায় যে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল. সে জল এখন প্রত্যেকদিন ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। বর্ষার সময় স্টিমারটা একেবারে সোজা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তাটার গায়ে আসিয়া লাগে; প্যাডলের মুখে উছলাইয়া-ওঠা জল আর তক্তার ঘা খাইতে খাইতে রাস্তাটা খাড়াখাড়িভাবে অনেকখানিই জলের মধ্যে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ঝুরো মাটি আর ঘাসের শিকড় নদীর বাতাসে তির তির করিয়া দোলে। জল কমিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে আর স্টিমারের

নোঙর করিবার উপায় থাকেনা। তখন বাঁ-হাতি আরো অনেক খানি সরিয়া আসিয়া একেবারে সাহেবপুর হাটের নীচে যেখানে পলি মাটির দীর্ঘ আস্তরণ ফেলিয়া নদী তাহার চিহ্ন রাখিয়া গেছে, সেখানেই স্টিমারটাকে ভিড়িতে হয়।

শেষ রাত্রির অস্পষ্ট কুয়াশায় অনেকগুলি মানুষ আসিয়া এখানে ভিড় করিয়াছে; স্টিমারের জন্যই অপেক্ষা করিতেছে তাহারা। এ লাইনের এই জলযানগুলির আর যত ত্রুটিই থাকুক, নিয়মানুবর্তিতার অপবাদ তাহাদের অতি বড় শত্রুতেও দিতে পারেনা। যেদিন নদীর বুকে ঘন হইয়া হলদে কুয়াশা ছড়াইয়া পড়ে, সুকানির সন্ধানী আলো সেই নিবিড় জমাট আস্তরণ ভেদ করিয়া দু' পাশের তীরতট তো দূরে থাক—সামনের দশহাত পথ অবধি দেখিতে পায়না, সেদিন ঘর্ঘর্ করিয়া মস্ত একটা লোহার নোঙর জলে নামাইয়া দিয়া হয়তো অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য মধ্য নদীতে স্তব্ধ হইয়া থাকে। অথবা 'এ বাঁও মিলে-এ-না' বলিয়া সুর টানিতে টানিতে হঠাৎ যখন ডুবিয়া থাকা বালুচরের গায়ে ঘস করিয়া স্টিমারের চাকা ডুবিয়া যায়, তখন জোয়ার না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। যাত্রীদের যতখানি বিড়ম্বনা তাহার চাইতেও বেশি বিড়ম্বনা যাহারা আগ বাড়াইয়া নিতে আসে তাহাদের।

এই কথাই আজও চলিতেছিল। মুকুন্দ বলিল: দেখছ হে, আবার কেমন বিশ্রী কুয়াশা নামল। জাহাজ এ বেলা এসে পৌছয় কিনা কে জানে।

সনাতন শিহরিয়া বলিল: সেকি কথা। আজ মাল না এলে যে দোকানই খুলতে পারবনা। পূজোর পরে সব একেবারে সাফ হয়ে আছে, আজ তা হলে খদ্দের বিদেয় করব কী করে?

নলসিঁড়ির বাজারে সনাতনের কাপড়ের দোকান। গ্রামখানা বড় বলিয়াই বাজারটি মোটামুটি মন্দ নয়, সনাতনের ছোট দোকানটিও ইহারি মধ্যে ভালোয়-মন্দে বেশ একরকম চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য, পূজার সময় বাবুরা যখন বিদেশ হইতে একটিবার করিয়া দেশে পদার্পণ করেন, তখন কাপড়ের বড় বড় গাঁটও তাঁহাদের সঙ্গেই আসে। কিন্তু সকলের অবস্থা তো আর সমান নয়। যে সমস্ত নিম্নবিত্ত বাসিন্দাকে গ্রামেই বারো মাস কাটাইতে হয়, সনাতনের অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া তাহাদের উপায় নাই। দুই চার আনা বেশী লাভ যদি সে করে তো করুক কিন্তু মানুষের সব দিন এমন কিছু আর সমান যায় না। ধরো, পূজার সময় যেবার ছেলেপিলেকে কাপড় কিনিয়া দিবার সঙ্গতি থাকেনা, সেবার তো ধারের জন্য বাধ্য হইয়া তাহার কাছেই আসিতে হয়। টিনের দোকান ঘরটার কাঠের চৌকাঠের উপরে যদিবা কাঁচা অক্ষরে লেখা তোবড়ানো সাইন বোর্ড ঝুলিতেছে "স্বদেশী বস্ত্রালয়," তবুও পূজার এই সময়টাতে রেলি ব্রাদার্সের রূপালি ছবিওয়ালা ফুল-পেড়ে ধুতিগুলি দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যায়; বিলাতী কাপড়ে বোম্বে মিল্‌সের ছাপ-মারা মিহি বড় পাড়ের শাড়ীগুলি ঘরে ঘরে শারদীয়া উৎসব বর্ধনের সহায়তা করে।

তাহার কথার সূত্র ধরিয়াই মুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিল: এবার পূজোয় কত টাকা ঘরে তুললে, সনাতন কাকা?

সনাতন ভ্রূকুঞ্চিত করিল, মুখে তাহারা স্পষ্ট বিরক্তির ছায়া।

—ঘরে তোলবার আর উপায় রেখেছ তোমরা? কল্‌কাতার দোকান থেকে বেশী দাম দিয়ে কাপড় কিনে তোমরা তিনশো মাইল পথ ঘাড়ে করে আনবে অথচ আমরা কী দোষটা করলুম শুনি? সস্তায়

বাজিমাৎ করতে গিয়ে ওদিকে যে সব কাৎ হয়ে যাচ্ছে, সে খবর রেখেছে কখনও ?

মুকুন্দ শুধু যে সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িল, তাহাই নয়। উপরন্তু মুখের এমন একটা ভঙ্গি করিল যেন সনাতন ঠিক তাহার পেটের কথাটি টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়াছে।

দেখিয়া সনাতনের বক্তৃতা-স্পৃহা উদ্দীপিত হইল।

—আরে এই করেই-না দেশটা উচ্ছন্ন গেল। ব'লে দেশ স্বাধীন করবেন! আমরা গাঁয়ের লোক—বচ্ছরকার দিনে দু'টো পয়সা পাব—তা অবধি যাদের সয় না, তারা দেশ না ইয়ে স্বাধীন করবে—হুঁঃ!

অন্যান্য আরো দুইটি ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের চরিত্রগত ব্যবধান এই যে, তাহার জীবনে সব প্রশ্নগুলি জটিল বলিয়া কোন প্রশ্নটাই জটিল নয়। সনাতনের দিক হইতে অন্তত কথাটাকে নিঃসন্দেহে যাচাই করিয়া নেওয়া যায়। সম্প্রতি দেশের দুর্গতি ও দুর্মতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সে যখন দস্তুরমতো অনুপ্রাণিত বোধ করিতেছে এবং তাহার গলার স্বরও বিষয়বস্তুর গুরুত্বের অনুপাতে ক্রমশ চড়া পর্দায় চড়িতেছে, ঠিক সেই সময় তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া রসময়, শশিকান্ত ও টোনা একটা অতি মুখরোচক সরস-প্রসঙ্গের চর্চায় ব্যাপৃত ছিল।

কথা বলিতেছিল টোনা।

ছেলেটি দৈর্ঘ্যে কম, কিন্তু মাত্রাহীন প্রস্থ তাহার সে অভাব মিটাইয়া দিয়াছে। নানা দিক হইতে সে গ্রামের মধ্যে অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। গানের গলাটি তাহার চমৎকার। এই কিছুদিন আগেও এ সমস্ত অঞ্চলে চাঁদপুরী কীর্তনের ঘটা পড়িয়া গিয়াছিল। বরিশালের একান্ত নিভৃত বুকের মধ্যে এই যে নাতিদীর্ঘ বাসুদেবপুর

গ্রামটি, এখানে পর্যন্ত তাহার ঢেউ আসিয়া পৌছিয়াছিল। দত্ত বাড়ীর ছোট নাতির অন্নপ্রাশনে 'বাটাজোড় হইতে কৃষ্ণযাত্রার একটি দল আসিয়া তিন রাত্রি নিমাই সন্ন্যাস গাহিয়া চারিদিক একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। সেই অবকাশে টোনার স্বাভাবিক সঙ্গীত-প্রতিভাও নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে নাই। গ্রাম হইতে কৃষ্ণ-যাত্রার দলটি বিদায় লইবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই একটা কীর্তনের দল গড়িয়া ফেলিল। শাদা-রঙের চাদর চড়াইয়া, গলায় মল্লিকা ফুলের মালা জড়াইয়া, ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত গ্রাম্য নরনারীর ছোট একটি আসরের একপাশে দাঁড়াইয়া যখন বিষ্ণুপ্রিয়ার জবানীতে সুর ধরিও :

"খসিয়া পড়িল কানেরি সোনা মাগো
অমঙ্গলের চিহ্ন যায় গো জানা,—"

তখন আসরের ডান পাশের চিকের আড়ালে শুধু মেয়েরাই নন, মুহূর্তের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার অমঙ্গল আশঙ্কায় বিধুর মুখখানি কল্পনা করিয়া বয়স্ক প্রবীণদের চোখও ছল ছল করিয়া আসিত।

নিজের এই সঙ্গীত-ক্ষমতার গুণে টোনা একটা বিশেষ দিক দিয়া অত্যন্ত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। লোকে বলিত, সমগ্র বৈরাগী পাড়ায় সে কৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দৈহিক রূপ বা মুরলীর পরিবর্তে গান—ইহাতে তাহার কৃষ্ণত্ব সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কারণ ছিলনা; কিন্তু কী যে সাধারণের মনোবৃত্তি, এতটাই যদিবা সহিতে পারিল, গোপিনী সম্পর্কিত ব্যাপারে কেন যে তাহাদের চোখ খাড়া হইয়া ওঠে, সেটা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না।

কিন্তু বলিতে বাধা নাই, বৃন্দাবন লীলার প্রতিই টোনার আকর্ষণটা

স্বাভাবিকভাবে একটু বেশি। নানা দিক হইতেই নানা রূপে রঙে তাহা প্রকাশ পাইতেছিল। পরে সেটা বিস্তৃত হইবে।

আপাতত এখানে আসিয়াও টোনা সেই জাতীয় একটা প্রসঙ্গেরই জের টানিতেছিল।

—মাইরি বলছি ভাই, কী চোখ-মুখের গড়ন! প্রায় বাগিয়ে এনেছি—আর দু'তিন দিন কেত্তন গাইতে পারিলেই ঠিক মজে যাবে।

রসময় রসটাকে পূর্ণ উপভোগ করিয়া অশ্লীল-ধরণে একটা শিস নিল। তারপর কহিল: কিন্তু ওর বাপ বড় কড়া লোক রে, দেখিস শেষকালে ঠ্যাঙা খেয়ে ঠ্যাং ভেঙে না আসিস।

শশিকান্তের চোখে ঈর্ষ্যাটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বয়স তাহার পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, কিন্তু বিকৃত পথ বাছিয়া নিয়া এই যৌবনেই তাহার দেহের উপর দিয়া যেন অক্ষমতার বার্ধক্য নামিয়াছে। এই ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে যদি তাহার দিকে ভালো করিয়া তাকানো যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখা যাইত, কালি মাখানো কোটরের মধ্য হইতে ঘোলাটে চোখ ব্যর্থ লোভে চকচক করিতেছে তাহার। টোনাকে সে মনের দিক হইতে আদৌ পছন্দ করে না, প্রজাপতির মতো তাহার সহজ মধুলেহী জীবন শশিকান্তের বুকের মধ্যে জ্বালা ধরাইয়া দেয়। সে মনে মনে হিংস্রভাবে কামনা করে, সত্যি সত্যিই কেউ একদিন ঠ্যাঙা মারিয়া টোনার ঠ্যাং ভাঙিয়া দিক, ডাণ্ডা বসাইয়া একেবারে ঠাণ্ডা করিয়া রাখুক! ওই তো কালো মোটা কোলা ব্যাঙের মতো চেহারা, মেয়েরা উহারই মধ্যে এমন কী পাইয়াছে? না হয় মিহি সুরে চিঁহি চিঁহি করিয়া খানিক চেঁচাইতেই পারে। কিন্তু কাহারও যোগ্যতা বিচার করিতে এইটুকুই সব নাকি? শশিকান্তই বা এমন কী

দোষটা করিয়াছে? চেহারা অবশ্য তাহার খুব চিত্ত-চমৎকার নয়; তার উপর গত বৎসর বসন্ত হইয়া সমস্ত গালে কপালে কতগুলি বিশ্রী চিহ্ন আঁকিয়া গিয়াছে। জীবনী-শক্তিহীন মেরুদণ্ডটায় একটা বিসদৃশ ভাঁজ পড়িয়া ঘাড়টা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া নামিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সত্যি সত্যিই কি সে এত অবজ্ঞার যোগ্য? নাঃ, মেয়েগুলার রুচির উপর শ্রদ্ধা তাহার কমিয়া আসিতেছে।

শশিকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলঃ পূর্বজন্মে বিস্তর সুকৃতি ছিল তোর, কিন্তু মাঝখানে আবার আয়ান ঘোষ আছে রে—একটু সামলে-টামলে চলিস।

—আরে যাঃ-যাঃ-যাঃ—বিড়ির চিহ্নে কলঙ্কিত গোরুর ঠোঁটের মতো পুরু নীচের ঠোঁটটাকে নাকের দিকে প্রায় ইঞ্চিটাকে ঠেলিয়া তুলিয়া টোনা কহিলঃ ডজন দু-তিন মেয়ে পার করে এলুম, বুড়া বয়সে তুই আমায় আয়ান ঘোষের ভয় দেখাচ্ছিস? মেয়ে জাতটাকে আমি জানি, ওদের দায় কী করে ওদেরই ঘাড়ে চাপাতে হয়—তাও না জানি এমন নয়।

আড়িয়ল খাঁ নদীর বুকের উপর ঝিমাইয়া-পড়া অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে, একটু একটু করিয়া শাদা রঙ পড়িতেছে নীচের কালো জলে। কুয়াশা নামিয়াছে বটে, কিন্তু খুব ঘন হইয়া নয়। দশ বারো বছর আগে আড়িয়ল খাঁর ঠিক মাঝামাঝি মস্ত বড় একটা চড়া জাগিয়াছে এবং ফলে স্টিমারের চলা চলতির পক্ষে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। সাহেবপুর স্টিমার ঘাটের ঠিক ওপারেই নীলগঞ্জের বাজার; কিন্তু চড়াটা থাকার দরুণ জাহাজ আজকাল সোজাসুজি পাড়ি জমাইতে পারেনা,—চড়াটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রায় তিন মাইল পথ ঘুরিয়া আসিতে হয়। তবু প্রভাতের স্নিগ্ধ স্বচ্ছতায় অনেক দূর হইতেই তিন চারিটী লাল নীল

আলো ঝাপসা দেখিতে পাওয়া যায়—বাঁশির অতি গম্ভীর শব্দ শান্ত আকাশের তলা দিয়া ভাসিয়া আসে।

প্রতীক্ষমান জনতা এক সঙ্গে সচেতন হইয়া ওঠে, বহু মানুষ এক সঙ্গে নানা সুরে কলরব করিয়া ওঠে—জাহাজ আসছে—জাহাজ আসছে।

ইহার আগেই মুন্সী সাহেবের ঘুম ভাঙে। এই অখ্যাততর স্টিমার ঘাটের সে অখ্যাততম কেরাণী। শীর্ণদেহ মধ্যবয়সী লোকটি, বিনয়ে সর্বদা আনত হইয়াই আছে। বহুদূরের বাতাস বহিয়া স্টিমারের গম্ভীর বাঁশি ভাসিয়া আসে। বদনা হইতে চোখেমুখে খানিকটা জল ছিটাইয়া মুন্সীসাহেব কাঠের একটি ছোট বাক্স লইয়া চড়ার উপর নামিয়া যায়। এই বাক্সটিই তাহার বুকিং অফিস। জনতার মাঝখানে বাক্সটি খুলিয়া বসিয়া সে টিকিট বিক্রি করে, ছাপানো ছককাটা হলদে কাগজে ভোঁতা কপিয়িং পেনসিল দিয়া অঙ্ক কসে; গোল একটা পাথরের টুকরো তাহার বাক্সে সঞ্চিত আছে, টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি টুং করিয়া সেই পাথর খণ্ডে বাজাইয়া যাচাই করিয়া লয়।

বাড়ি তাহার চট্টগ্রাম অথবা কুমিল্লা—অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গের একেবারে শেষপ্রান্তে। আগে সে নাকি কোথায় স্টিমারের ডকে কী একটা চাকরী করিত। তারপর একটা দুর্ঘটনায় হাতখানা তাহার কনুই ঘেঁসিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। সেই হইতে সে এই স্টিমারঘাটের কেরাণীগিরি পাইয়াছে। একটা হাত তাহার নাই, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রতীকারবিহীন অভাবটাকে বহন করিতে করিতে অভাব বোধ করিবার মনোবৃত্তিই তাহার লোপ পাইয়াছে।

এদেশের সঙ্গে তাহার ভাষা মেলে না, আচার মেলে না, মনও মেলে না হয়তো। মুন্সী সাহেব সেই জন্য অসামাজিক।

প্রতিবেশী অর্থাৎ সাহেবপুরের মুসলমান সমাজ মাঝে মাঝে কোরাণের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। কাহারও সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সে নিজেও করে না, আর কেউ করিতে সাহসও পায় না। তা ছাড়া আর আছে এ অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর কয়েকঘর বৈরাগী, নিজেদের দলাদলি, গাঁজার কল্‌কে, হরি-সংকীর্তন এবং বৈষ্ণবীতত্ত্ব লইয়াই খুব বেশি বিব্রত থাকে তাহারা। সুতরাং তাহাদের সঙ্গেও মুন্সী সাহেবের সংস্রব না থাকিবারই কথা।

অন্য দিনের মতো আজও মুন্সী সাহেব টিকিটের বাক্স লইয়া টিকিট বিক্রি করিতে আসিল এবং আড়িয়ল খাঁর মাঝখানে লম্বা চড়াটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আবছায়া অন্ধকারে স্টিমারের দীর্ঘ দেহটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কালো জলের উপর তিন চারটি আলো লাল সবুজের দীর্ঘ বেপথু্ রেখা আঁকিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, চাকার মধ্য হইতে কাঠের বৈঠার জল টানিবার শব্দটা অত্যন্ত কাছে বলিয়া মনে হইতেছে। আর পাঁচ মিনিট, বড় জোর সাত আট মিনিটের মধ্যেই স্টিমার আসিয়া পড়িবে।

নদীর মধ্যে যে সমস্ত ইলিশ-মাছের নৌকা এলোমেলো ভাবে ঘুরিতেছিল, তাহাদের খানকয়েক এই সময় স্টিমারে কিছু বিক্রি করিবার আশায় একেবারে তীরের কাছাকাছি চলিয়া আসিয়াছে। জনতার মধ্য হইতে একজন প্রশ্ন করিল : কি গো কত্তা, মাছ আছে নৌকায় ?

পায়ে বৈঠা লাগাইয়া দু'হাতে তামাক টানিতে টানিতে কত্তা জবাব দিল : আছে গোটা চারেক। কিন্তু কণ্ঠস্বর তাহার এত নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত যে, মাছ বেচিবার জন্য একবিন্দু আগ্রহও তাহার আছে বলিয়া মনে হইল না।

—জোড়া কত করে বেচবে ?

মাঝি নৌকা না থামাইয়া পায়ে বৈঠা টানিতে টানিতে তেমনি তেমনি উদাসীনভাবে কহিল : ছ’আনা !

—ছ’আনা ! ওরে বাবা ! ইলিশ মাছে আগুন লেগেছে নাকি ?

মাঝি উত্তর দিল না—বোধ হইল যেন দিবার প্রয়োজনই অনুভব করিল না। প্রশান্ত গাম্ভীর্যে সে হুঁকাটাকে নামাইয়া হাতে বৈঠা তুলিয়া লইল এবং পরিপূর্ণ অবজ্ঞায় একবার ইহাদের দিকে তাকাইল মাত্র।

একজন-মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল : ওরে আমার লাট সাহেব রে ! সোনার দরে ইলিশ মাছ বেচবে !

আর একজন কহিল : বুঝতে পারছ না, জাহাজী খালাসিদের কাছে কর্‌করে কাঁচা পয়সা পায় যে। জাহাজটা চলে যাক, তারপর তিন আনায় ঐ মাছের জোড়া বেচবার জন্যে ঝুলোঝুলি না করে তো কী বলে দিলাম—হাঁ !

এ পাশে তিন চারটি ছেলে অনেকক্ষণ ধরিয়া পলিটিক্‌স আলোচনা করিতেছে। বয়সে তাহারা সকলেই তরুণ, একজনের মাথায় আবার একটা খদ্দরের টুপী। সব চাইতে বেশি উত্তেজিত হইয়াছে সেই-ই। মনে হইতেছে, দেশের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত এমনি টগবগ করিয়াই ফুটিতেছে যে সে নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

প্রবলভাবে সে বলিতেছিল : প্রোগ্রাম তো আমাদের সামনে মেলাই আছে। এই কথাটাই আজ আমাদের স্পষ্ট করে জানতে হবে, যারা অস্ত্রবলে দেশ জয় করে নেয়, আবেদন-নিবেদন বা অহিংসার নরম বক্তৃতায় তারা কখনও জয়ের সে অধিকার ছেড়ে দিতে চায় না।

রেজোলিউশন তো বহু করেছ, দাবী দাওয়াও কম হয় নি, কিন্তু কী উত্তর পেয়েছ তার? উত্তর পেয়েছ—জালিয়ানওয়ালা, উত্তর পেয়েছ—চৌরিচৌরা, উত্তর পেয়েছ—

মুকুল বলিয়া যে ছেলেটি এতক্ষণ নীরবে ইহাদের আলোচনা শুনিতেছিল, সে এইবার মৃদু হাসিয়া কহিল: থাম, রবি থাম। এটা স্টেশন ঘাট, বক্তৃতার প্ল্যাটফর্ম নয়। তার চাইতে ওই ভাখ, স্টিমার এসে গেছে।

বাধা পাইয়া রবি একবার মুকুলের দিকে চাহিল। মুকুলকে সে পছন্দ করে না। বাহিরে প্রকাশ না থাক, তবু যেন রবি সর্বদাই মুকুলের মুখে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি দেখিতে পায়, যেন মনে হয়, সে তাহার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ভঙ্গিকে অবধি অবিশ্বাস করিতেছে। কিন্তু তবুও রবি মুকুলের উপর কোন একটা কড়া কথা বলিতে সাহস পায় না—যেন তাহার চাইতে বৃহত্তর একটা ব্যক্তিত্বের কাছে সে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

মুকুলের কথার মধ্যে কী ছিল কে জানে, রবির শ্রোতারাও এক সঙ্গেই চকিত হইয়া উঠিল:

—তাই তো স্টিমার এসে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ব্যস্ত হইয়া জলের দিকে আগাইয়া গেল। রবি এক মুহূর্ত থামিয়া দাঁড়াইয়া একটু ইতস্তত করিল শুধু।

বহু-প্রতীক্ষিত ষ্টিমারটা এতক্ষণে তাহা হইলে আসিয়াই পড়িয়াছে। পিছনে আড়িয়ল খাঁর জল ফেনাময় হইয়া উঠিয়াছে, বড় বড় ঢেউ উঠিয়া তীরের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। ইলিশ মাছের নৌকাগুলি ঢেউয়ের মুখে মোচার খোলার মতো নাচিতেছে; একবার সম্মুখে, আর একবার পিছনে উঁচু হইয়া উঠিতেছে, যে কোনো মুহূর্তেই

ডুবিয়া যাইতে পারে বা। কিন্তু ডুবিবে না যে, তাহা জেলেরাও জানে, দর্শকেরাও জানে।

স্টিমার একেবারে তীরের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সামনে নীল পোযাকপরা খালাসিরা আসিয়া ভিড় করিয়াছে, দো-তলার ডেকে সদ্য ঘুম হইতে জাগা যাত্রীদের অলস দৃষ্টি।

তারপর কয়েক মিনিট ব্যস্ততা আর কোলাহল। নোঙর ফেলিয়া সিঁড়ি নামাইয়া দেওয়া হইল, যাত্রীরা নামিতে সুরু করিল। একজন—দুইজন—তিনজন, চতুর্থজন নামিতেই এদিককার পলিটিক্স আলোচনা-কারী ছেলের দল গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।

যে নামিয়াছিল, দশজনের মধ্য হইতেও তাহাকে সকলের আগে চোখে পড়ে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, সুশ্রী হয়তো বলা চলে না, কিন্তু সুপুরুষ বলা যায়। পুরু চশমার আড়াল হইতেও তাহার দৃষ্টি যেন ঝকঝক করিতেছিল।

মুকুলই প্রথমে কথা কহিল। দুই পা সামনে অগ্রসর হইয়া সে এক নমস্কার করিল, তারপর মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল: মাপ করবেন, আপনিই প্রফুল্ল বাবু তো?

—ধরেছেন ঠিক—যাত্রীটি হাসিয়া ফেলিল, আমারই নাম প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। আপনারা?

—সেক্রেটারী আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমার নাম মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় আর এঁরা—

মুকুল দলের সকলের পরিচয় দিল।

প্রফুল্ল কহিল: নমস্কার। আপনারা এসে ভারি উপকার করেছেন আমার। এ অঞ্চলে আর কোন দিন আসিনি কি না, তাই পথ-ঘাট চিনিনে।

রবি জিজ্ঞাসা করিল: আপনার আর সব লগেজ কোথায়?

—লগেজ? আর লগেজ দিয়ে কী হবে? প্রফুল্ল এক হাতে ফাইবারের একটা সুটকেশ এবং আর এক হাতে সতরঞ্চি জড়ানো একটা ছোট বিছানা দেখাইয়া কহিল: এই লগেজেই সব রয়েছে। একা মানুষ মশাই, বেশি জিনিষপত্তর দিয়ে কী করব? ও বড় বালাই! শেষে নিজেকে সামলাব না লগেজ সামলাব, তাই নিয়েই সমস্যায় পড়তে হয়।

সকলেই হাসিল এবং সব চাইতে বেশী করিয়া হাসিল রবি। এমন ভাবেই হাসিল যে, জীবনে ইহার চাইতে হাসির কথা সে বুঝি আর কখনো শোনে নাই। স্টিমারঘাট চকিত হইয়া উঠিল এবং প্রফুল্ল অবধি বেশ খানিকটা বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল।

মুকুল কহিল: কিন্তু এখানে আর দেরি করে লাভ কী? যেতে যেতেই এক ঘণ্টা সময় কেটে যাবে যে। কিসে যেতে চান্? নৌকায় না হেঁটে?

—কতদূর যেতে হবে বলুন দেখি?

—মাইল দুয়েক। ভালো রাস্তা আছে, হেঁটে যেতে অসুবিধে নেই। আর যদি নৌকোয়—

—পাগল! প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিল, দু মাইল পথের জন্যে নৌকো করব, বলেন কী? ও রকম অভদ্র বিলাসিতা আমার নেই। চরণ দুখানা যতক্ষণ সুস্থ আছেন, ততক্ষণ আট দশ মাইল পথের জন্যে ভাবনা নেই আমার। চলুন।

রবি কিন্তু ইহারই মধ্যে বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে।

—চলুন, সেই ভালো। সবাই মিলে গল্প করতে করতে যাওয়া যাক্। কিন্তু বাক্স বিছানা দুটো—

—বড় জোড় বিশ সের। সে জন্যে ভাবনা নেই, চলুন হাঁটা যাক।

সবাই চলিতে আরম্ভ করিল। স্নিগ্ধ সকালের আলো তখন আড়িয়ল খাঁর বুকের উপর রঙ মাখাইয়া দিতেছে, গাছ পালার আড়ালে আড়ালে রোদের টুকরো আসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। পায়ের নীচে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা। সকালের শিশির-বিন্দু সে পথ ভিজাইয়া রাখিয়াছে, প্রথম প্রভাতের ঘাসের গন্ধ মন্থর বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পথের পাশ দিয়াই খাল। এখানে ওখানে বাঁশের 'চার', উবুড় হইয়া থাকা গাব-মাখানো ডিঙ্গি, নারিকেল সুপারির ঘন-বিন্যাস, গৃহস্থ বাড়ীর টিনের চাল। আর একপাশে ভাঁট ফুলের ঘন জঙ্গল পথের উপরে নুইয়া পড়িয়াছে।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরবে চলিতে লাগিল। তারপর মুকুলই আবার কথা কহিল।

—দেখুন, ইস্কুলটাকে আগাগোড়া নতুন করে গড়ে তোলা দরকার। এর আগে যিনি হেডমাস্টার ছিলেন, তিনি নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরির লোক। সুতরাং ইস্কুলটাকে যা করে রেখে গেছেন, তা মর্মান্তিক; আপনার কাছে নতুন কিছু একটা পাব বলেই আমরা আশা করি।

রবি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

—নিশ্চয়! নিশ্চয়! বুড়ো আহাম্মুকটা ইস্কুলটাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেছে। আরে বাবা, ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ কিংবা গড্ সেভ দ্য কিং—এ নিয়ে কী আর—

কিন্তু মুকুলের চোখের দিকে চোখ পড়িতেই রবি থামিয়া গেল। এই দৃষ্টিটাকেই কেমন সহ্য করিয়া উঠিতে পারে না সে। ইহার চাইতে মুকুল তাহার মুখের উপর কষিয়া একটা থাবড়া মারিলেও সে এতটা

দমিয়া যাইত না। কথার প্রতিবাদ চলে কিন্তু চোখের প্রতিবাদ নাই।

কিন্তু প্রফুল্ল সে সব লক্ষ্য করিল না। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল: কী রকম?

মুকুল কটাক্ষে একবার রবির দিকে চাহিয়া কহিল: প্রথমত ছেলে-গুলোকে ওভার-লয়্যাল্ করে তোলা হচ্ছে, তাদের কোনোরকম উন্নতির দিকেই ইস্কুল কমিটির দৃষ্টি নেই। দ্বিতীয়ত পার্টিগত ব্যাপারে—

প্রফুল্ল বিস্মিত হইয়া বলিল: পার্টি! ইস্কুলে আবার পার্টি কিসের?

মুকুল অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে হাসিল।

—সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না। এ সব আভিজাত্যের কথা—সমাজের একেবারে গোড়াকার প্রশ্ন।

প্রফুল্ল আরো বিস্মিত হইয়া বলিল: আভিজাত্য?

—নিশ্চয়! আচ্ছা, সবটা বুঝিয়ে বলি আপনাকে। আমাদের গ্রামটা বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ প্রধান, কয়েক ঘর সাহা সম্প্রদায়ের বড় বড় ব্যবসায়ীও আছেন। প্রতি বছরই গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য স্কুলের প্রেসিডেণ্ট হয়ে আসছেন। কিন্তু এবার এক সাহা ভদ্র-লোক প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁকে প্রেসিডেণ্ট করলে করলে তিনি ইস্কুল বাড়ীটা পাকা করে দেবেন। লোকটীও নিতান্ত অযোগ্য নন—গ্র্যাজুয়েট, বিশিষ্ট ধনী—

—তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে নিশ্চয়?

—ক্ষেপেছেন আপনি! বাসুদেবপুর গ্রামে তিনশো ঘর প্রবল পরাক্রান্ত বামুনের বসতি থাকতে এতবড় একটা সামাজিক কদাচার

ঘটবে এ আপনি কী করে অনুমান করেন? তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা দূরে থাক, বিবেচনাই করা হয়নি।

—সর্বনাশ! বলেন কি!

—যা বললাম। ফলে কী হল জানেন? দু দলে লাঠালাঠির উপক্রম, শেষ পর্যন্ত এক নিরক্ষর মাতাল মুসলমান জমিদারকে প্রেসিডেণ্টের গদিতে বসিয়ে দুই প্রতিপক্ষ ক্ষান্ত হয়েছেন!

প্রফুল্ল হাসিল: এতে আপনি ক্ষোভ করছেন কেন? শূদ্রের দানে আপনাদের পবিত্র ইস্কুল কলঙ্কিত হল না—খাঁটি আর্যতন্ত্র আর কাকে বলে।

দলের একটি ছেলে আগাইয়া আসিয়া কথা কহিল।

—জানেন না, এককালে আমাদের গাঁয়ের নাম নিম্ন নবদ্বীপ ছিল যে! ছিয়ানব্বুইটা টোল ছিল এখানে—মহা মহা পণ্ডিতও ছিলেন অজস্র। কবিরাজী নিদান লেখক মাধব করের নাম শোনেন নি?

প্রফুল্ল সভয়ে কহিল: তাই নাকি। একেবারে ছিয়ানব্বুইটা টোল! এখনো আছে?

মুকুল হাসিয়া বলিল: আছে, তবে অত নেই, সবে তিনটেতে ঠেকেছে।

পথ খুব যে বেশি তা নয়, কিন্তু কথায় কথায় ওদের অজ্ঞাতেই বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। বৈরাগীপাড়া, মাটির দোলমঞ্চ, তারপর রাধাশ্যামের অঙ্গন পার হইয়াই মুসলমানদের বস্তি। কিন্তু বৈরাগীদের চাইতে ইহারা সমৃদ্ধ। টিনের বড় বড় আটচালা—গোবর-লেপা মরাইগুলি আউশ ধানে স্ফীত হইয়া আছে। একপাশে প্রকাণ্ড খড়ের পালা, তাহার ঠিক মাঝখান দিয়া লম্বা সুপারি গাছ ধ্বজার মতো মাথা তুলিয়াছে। সোণালি খড়ের উপর শিশির-কণা সূর্যের আলোয়

জ্বলিতেছে। ঝুঁটিওয়ালা একটা ধাড়ী মোরগ মাথা তুলিয়া গম্ভীরভাবে চাহিয়া আছে, একটু দূরেই তিন চারটা ছোট ছোট বাচ্ছা টুকটুক করিয়া কী খুঁটিয়া খাইতেছে।

পৃথিবী সুন্দর—পরিমণ্ডলটা আরও সুন্দর; কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে পচা পাটের গন্ধে প্রায় দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। এক পাশে ছোট একটা ডোবার মধ্যে রাশীকৃত পাট ভিজানো, বাঁশ বনের ছায়ায় জমাট খানিকটা টকটকে ঘন লাল জলের উপর দিনের বেলাতেই ভন ভন করিয়া মশা উড়িতেছিল।

সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া প্রফুল্ল আবার আগের কথাটাই টানিয়া আনিল।

—ইস্কুলের অবস্থা সবই শুনলাম। কিন্তু আমাকে কী করতে বলেন আপনারা?

মুকুল কী ভাবিতেছিল। অন্তর্মুখী চোখ দুইটা তুলিয়া অন্যমনস্কের মতো বলিল: আপনার কী মনে হয়?

প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না। সে যেন শুনিবার জন্যই প্রস্তুত ছিল, বলার জন্য নয়। তাহার কপালের গোটা কতক রেখা আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। মনে মনে যেন সমস্ত জিনিষগুলিকেই একবার বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া বলিল: এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার বই কি। কিন্তু ইস্কুল কমিটির সেন্টিমেণ্ট না জেনে আগে থেকে কী বলতে পারি, বলুন?

রবি অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বলে নাই। স্বভাববিরুদ্ধ বাধ্যতামূলক সংযমে সে মনে মনে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। মুকুলের এই ধরণের মুরুব্বিয়ানা সে চোখ পাড়িয়া দেখিতে পারে না। না হয় এম-এতে ফার্স্টক্লাস পাইয়াই ঘরে ফিরিয়াছে—কিন্তু তাহাতে এমন কী

আসিয়া গেল! আজকালের দিনে এম-এ পাশ না করিতেছে কে? আর ফার্স্ট ক্লাশ? ওঃ, তাহাতেই একেবারে খাঞ্জা খাঁ বনিয়া গেল মুকুল! ওরকম ফার্স্ট ক্লাশ আজকাল কলিকাতার পথেঘাটে গড়াগড়ি যায়। আচ্ছা, আচ্ছা, দিন সেও একবার পাইবে। তখন যদি—

কিন্তু এ চিন্তাটা তাহার এই মুহূর্তের নয়, বা এতগুলো কথা যে সে একসঙ্গে ভাবিয়া লইল তাহাও নয়। ইহারা তাহার মনের মধ্যে এমন ভাবেই জড়াজড়ি করিয়া আছে যে, চিন্তার সূক্ষ্ম সূতাটিতে একবার টান পড়িলেই এগুলি বিদ্যুৎ চমকের মতো মনের সম্মুখ দিয়া খেলিয়া যায়। নাঃ, মুকুলের নিঃশব্দ শাসন সে আর নীরবে মানিয়া লইবে না, দস্তরমতো বিদ্রোহ করিবে। রবি মনে মনে হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে যেন।

—আরে রাখুন মশাই আপনার ইস্কুল কমিটি! ও কমিটি ভাঙতে কতক্ষণ? যত সব চোরের আড্ডা হয়েছে কমিটিতে, বুঝলেন না? বললে বিশ্বেস করবেন না, দুখু সেন ইস্কুলের টাকা ভেঙে নিজের বাড়ীতে এবার চণ্ডীমণ্ডপ বানিয়েছে। আর গিয়ে দেখুন, বিশ্বেশ্বর চাটুয্যের বাড়ী, ইস্কুলের যত ভালো ভালো চেয়ার-টেবিল তার বৈঠকখানার শোভা বাড়াচ্ছে।

প্রফুল্ল মৃদু হাসিল। বলিল: দেখুন যতক্ষণ প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ এ সব কথা বলে লাভ নেই। গ্রামের দশজনের ইস্কুল, যতটা পারা যায় সকলের সঙ্গে মানিয়ে—

রবি উত্তেজিত হইয়া কহিল, আর মশাই মানিয়ে! চুরির প্রমাণ নেই বলতে চান? বঙ্কিম মুখুয্যের বাপের শ্রাদ্ধে এই যে রাজ্যির টাকা—

কিন্তু কথাটা রবি সামলাইয়া লইল। ওপাশের বাঁশের 'চার' * টার উপর বড় বড় পা ফেলিয়া বঙ্কিম মুখুয্যের ভাইপো নন্তু পার হইয়া আসিতেছে। হাতে বাজারের একটি থলি, নলসিঁড়ির বাজারে মাছ কিনিতে চলিয়াছে। বাজারে আজকাল মাছ আর বেশি ওঠে না, অধিকাংশই গৌরনদীর গঞ্জে অথবা বরিশালে চালান হইয়া যায়। সুতরাং যাহারা মৎস্যলোভী, তাহাদের সকালে উঠিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে বাজারের পথে ছুটিতে হয়।

ইহাদের দিকে চাহিয়া নন্তু থমকিয়া দাঁড়াইল; একবার সে প্রফুল্লের সর্বাঙ্গ ভালো করিয়া দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া লইল, যেন তাহাকে চিনিবার বা তাহার সম্বন্ধে কিছু একটা নিশ্চিন্তভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। চোখের দৃষ্টিতে তাহার নির্বোধ কৌতূহল। বুদ্ধিমান বলিয়া সুখ্যাতি তাহার নাই, ইস্কুলের গণ্ডিও সে পার হইতে পারে নাই; ম্যাট্রিক ক্লাশে বার কয়েক ঘা খাইয়াই পড়াশোনার অব্যাপারটাকে সে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে। কাজের মধ্যে আজকাল সে খেপলা জাল লইয়া খালের চুণোপুঁটী হইতে সুরু করিয়া গেঁড়ি-গুগলি অবধি চলিয়া বেড়ায়; পাড়ার কাহারো বাড়ী ক্রিয়াকর্ম হইলে কোমর বাঁধিয়া ভূতের মতো খাটে এবং রাক্ষসের মতো খায়; নষ্টচন্দ্রের ব্যাপারে পরের নারিকেল-বাগান উজাড় করিয়া আনে; আর গ্রামের কোথাও মানুষ মরিলে সবার আগেই সে কাঁধ দিবার জন্য আগাইয়া যায়। গ্রামের লোকের সে শ্রদ্ধাভাজন নয়, তাহার নির্বুদ্ধিতার কাহিনী বিশ্ব-বিশ্রুত। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাহার মূল্য অস্বাভাবিক বাড়িয়া যায়। তাহাকে না হইলে কাহারো ক্রিয়াকর্ম সম্পূর্ণ হইবার জো কী!

* সাঁকো।

নন্তু প্রশ্ন করিল : জাহাজঘাটে গিয়াছিলে নাকি রবি দা ?

কথার মধ্যে বাঁধা পড়ায় রবি চটিয়া গিয়াছিল। তাই সংক্ষেপেই উত্তর দিল, হুঁ।

—ইনি কে এলেন ?

রবি বিরক্তভাবে ঘাড় ফিরাইল।

—তা দিয়ে তোমার কী দরকার ? সবার পরিচয়ই দিতে হবে নাকি তোমাকে ?

নন্তু রাগ করিল না। নির্বোধ মুখের উপর অপরূপ একটা ভঙ্গি টানিয়া আনিয়া সে ইহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ভঙ্গিটা হাসির না কৌতুকের, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া আবার প্রশ্ন করিল, মাইরি বলো না রবিদা, রাগ করছ কেন ? নতুন লোক দেখছি, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম—

রবি চড়া সুরে কহিল : না, এমন জিজ্ঞেস করতে নেই। ইনি ইস্কুলের নতুন হেডমাস্টার, হল তো ? সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্কটা তো অনেককাল কাটিয়েছ। এখন আবার এমন কৌতূহল কেন ?

আর কেউ হইলে হয়তো লজ্জা পাইত, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই পাইত ; কিন্তু নন্তু সে ধাতের ছেলেই নয়। তেমনি অপরূপ কৌতুকময় মুখেই সে রবির এতবড় কথাটাকেও নিশ্চিন্ত নীরবে হজম করিয়া লইল। তারপর ইহারা কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গেলে সংক্ষিপ্ত মতামত প্রকাশ করিল, ইঃ, মেজাজ দেখনা একবার ! যেন শায়েস্তাবাদের নবাব আর কি ?

সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—রবির সেটা মর্মে গিয়া বিঁধিল। অস্পষ্টভাবে সে শুধু বলিল : "ঈডিয়ট"। তাহার বেশী কিছু বলিয়া বসিতে তাহার সাহস হইল না। নন্তুটা যা গোঁয়ার ! গায়েও বিলক্ষণ শক্তি রাখে—

একবার রাগ হইয়া গেলে লঘু-গুরু মানিবে না। তাহাকে ঘাঁটানোটা নিরাপদ নয়।

দলের কেউ কেউ হাসিল। একজন বলিল: ভারী ঠোঁটকাটা হয়ে উঠেছে হতভাগা।

বহুক্ষণের নীরবতা ভাঙিয়া মুকুল এতক্ষণে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। বলিল: কিন্তু যেচে ঝগড়া করা ওর স্বভাব নয়।

রবি উগ্রভাবে কহিল: তুমিই ওকে অতিরিক্ত আস্কারা দাও কিনা। মুকুল উত্তর দিল না।

এতক্ষণে পথ শেষ হইয়া সকলে শিববাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই শিববাড়ীই গ্রামের কেন্দ্র। বাবুগঞ্জের বড় নদী হইতে বাহির হইয়া যে খালটি বামুনদিয়ার নীচ দিয়া সরিকলের হাট পার হইয়া, ঘণ্টেশ্বরের পুল একপাশে রাখিয়া একেবারে সোজা বাসুদেবপুরের বুকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সহিত এইখানে আড়িয়াল খাঁ হইতে বহিয়া-আসা কাটি-খালের সঙ্গম ঘটিয়াছে; তারপর শিববাড়ীর ছোট বাজারটিকে সাপের মতো একটা পাক দিয়া, গাঙ্গুলিদের বাড়ী ও বাগানকে প্রদক্ষিণ করিয়া সোজা মাহিলাড়া বাটাজোড়ের দিকে বহিয়া গিয়াছে। খালের তিন দিকের তিন মুখ বাহিয়া নানা অঞ্চলের ছোট বড় বহু নৌকা শিববাড়ীর ঘাটে আসিয়া ভিড় করে। তাদের মধ্যে 'কেরায়া' * নৌকার সংখ্যাই বেশি। মহাজনী নৌকাও না আসে তা নয়, কিন্তু তাহারা প্রধানত আসে বর্ষার সময়ে। তখন এতটুকু এই শুকনো খালটির চেহারা রীতিমত বদলাইয়া যায়। শিববাড়ী বাজারের একেবারে তলা পর্যন্ত হলদে জল উঠিয়া আসে, জোয়ারের সময় কান্ত নাগের দোকান ঘরের মাচা

* ভাড়াটে।

পর্যন্ত জল থল থল করিতে থাকে। শিববাড়ীর ঠিক পিছনে আর গাঙ্গুলিদের বাড়ীর বাঁকের মুখে বড় বড় ঘূর্ণীতে জল আর কচুরীপানা ঘুরিতে থাকে, হারাণ আর স্বরো জেলেরা দুই ভাই মাছের আশায় খালের মধ্যে বড় বড় বাঁশ পুঁতিয়া 'ভেসাল' * খাড়া করিয়া তোলে। গয়নার নৌকা বহু দূরের দত্ত বাড়ীর ঘাট ছাড়িয়া—ঠিক শিববাড়ীর নীচে আসিয়া ভিড়িতে পারে, সকাল-সন্ধ্যায় তাহাদের ডঙ্কার ডুম্ ডুম্ শব্দে গ্রাম মুখর হইয়া ওঠে।

শিববাড়ীর উপরেই গ্রামের পোস্টঅফিস। সুশীল মাস্টার এই সময়ে ডাক বাঁধিতে আসে। যাঁহাদের অসময়ে চিঠিটা-আসটা গছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, তাঁহারাও কোমরে কাপড় বাঁধিয়া দাঁতন করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের জন-কয়েক আজও এখানে দাঁড়াইয়াছিলেন।

এ দলটীকে প্রথমে যিনি দেখিলেন তিনি নরেশ কর। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি জেলার একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি বয়স কিছু বাড়িয়া যাওয়ায় তিনি সব ছাড়িয়া গ্রামে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু কাজ ছাড়িলেও রাজনীতিতে অনুরাগ তাঁহার প্রচুর। এবং সেই অনুরাগ হইতেই যেন কেমন করিয়া তাঁহার নিঃসংশয় ধারণা জন্মিয়া গেছে যে, গ্রামে তাঁহার মতো রাজনৈতিক বোদ্ধা আর দ্বিতীয়টি নাই; আরো বিশেষত্ব এই যে, নিজের সম্বন্ধে এ ধারণাটাকে ঢাকিয়া বা চাপিয়া চলিবার চেষ্টা তিনি কোন দিনই করেন না। প্রত্যেক দিন খবরের কাগজের প্রত্যেকটি লীডার হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞাপনগুলি পর্যন্ত তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়েন, দরকার হইলে কোন কোন বিশেষ 'সম্পাদকীয়' ঝরঝর করিয়া টানা মুখস্থ বলিয়া

---

* মাছ ধরিবার প্রকাণ্ড জাল বিশেষ।

যাইতে পারেন পর্যন্ত। পলিটিক্‌স্ সম্বন্ধে বলিতে গেলে তিনি এমনই উত্তেজিত হইয়া ওঠেন যে, শ্রোতারা তাঁহার ব্লাড্-প্রেশারের কথা স্মরণ করিয়া রীতিমত শঙ্কা বোধ করে।

একটা ভেরেণ্ডার দাঁতন সজোরে সামনের দুইটা বাঁধানো দাঁতের উপর ঘষিতে ঘষিতে তিনি সুশীল মাস্টারকে বর্তমান ওয়াকিং কমিটির সমস্যা বুঝাইতেছিলেন। সুশীল মাস্টার বুঝিতেছিলেন কি না কে জানে, কিন্তু শুনিতে যে ছিলেন না, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অনেক কাজ। দুই দিন ডাক পাঠাইতে দেরি হওয়ায় বাটাজোড়ের অফিস হইতে সেন্সার আসিয়াছে, ওভারসিয়ার আসিয়া কড়া কড়া কথা বলিয়াছে। এমন করিলে চাকরী থাকিবে না। আর ছাই, চিঠির উপদ্রবই কি কম। যতই দিন যায়, চিঠির ভিড় ততই বাড়িতেছে। একটু কম করিয়া পরস্পরের কুশল প্রশ্নের আদান-প্রদান করিলে লোকের যেন চিন্তায় ঘুম হয় না রাত্রে।

কিন্তু সুশীল মাস্টার শোনেন বা না শোনেন, সেদিকে নরেশ করের লক্ষ্য ছিল না। নিজের মনে তিনি বলিয়াই চলিয়াছেন, যেন নিজের কণ্ঠস্বর শুনিতেই তিনি ভালোবাসেন। হঠাৎ তাঁহার মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হইয়া আসিল।

ভেরেণ্ডার দাঁতনটাকে সোজা গালের এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া তিনি ছুটিয়াই বাহির হইয়া পড়িলেন।

—আরে, আরে, এই নাকি আমাদের নতুন হেড্‌মাস্টার মশাই? নমস্কার, নমস্কার।

প্রফুল্ল চকিত হইয়া চাহিল, কহিল: নমস্কার।

সুশীল মাস্টার নীরব শ্রোতা, কিন্তু সে পুরাণো হইয়া গিয়াছে এবং তা ছাড়াও সে এত নীরব যে, সময়ে সময়ে আদৌ শুনিতেছে কী না,

সন্দেহ হয়। সম্প্রতি নরেশ কর তাহার উপর হইতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

প্রফুল্লকে নূতন দেখিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া পরখ করিবার কৌতূহলটা স্বাভাবিক। এবং ভবিষ্যতে শ্রোতা হিসেবে সে কতকটা যে উৎরাইয়া যাইবে, সেটাও একবার যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন।

—বাঃ, বেশ বেশ। এই স্টিমারেই বুঝি এলেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—পথে কোন কষ্টটষ্ট হয়নি তো? আর যা পথ মশাই, প্রথমটা নদীর মর্জি, তারপর কুয়াসার মর্জি এবং সব্বার ওপরে স্টিমার কোম্পানীর মর্জি। তা অনেক দূর থেকে এলেন, সঙ্গে বিছানা-পত্তর কিছু দেখছি না যে?

স্যুটকেস্ আর বিছানা দেখাইয়া প্রফুল্ল কহিল: এই যে।

—মোটে এইটুকু? নরেশ করের কণ্ঠে যুগ-যুগান্তের বিস্ময় প্রকাশ পাইল: বলেন কী মশাই, ওর ভেতর আর কী আছে? একটা সতরঞ্চ আর একটা সুজনি—এর বেশি নিশ্চয় নয়? মশারি আনেননি তো? আরে মশাই, এখানকার যা মশা সে পেল্লায় ব্যাপার। এক একটা প্রায় ছোটখাট টুনটুনি পাখী আর কী। রাত্তিরে যখন কন্‌সার্ট সুরু ক'রে দেয়, তখন মনে হয় কী জানেন? কাণের কাছে যেন যাত্রার দলের জুড়িরা প্রাণপণে বেহালা বাজাচ্ছে।

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল: খুব মশা বুঝি?

—তবে আর বলছি কী? থাকবেন তো রাসমোহন সেনের বাড়ী? পেছনে একটা ডোবা আছে—হুঁ হুঁ। সন্ধ্যার সময় যখন সেখান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আকাশে উড়তে থাকে, তখন দেখলে

বোধ হয় যেন জার্মানীর একটা কারখানা থেকে হাজার হাজার বোমারু এরোপ্লেন—

কথার সঙ্গে সঙ্গেই ইঁহারা আগাইয়া চলিয়াছিলেন। কিন্তু এই পর্যন্ত বলিয়াই নরেশ কর হঠাৎ টক্ করিয়া থামিয়া গেলেন। তাঁহার মনে পড়িল, যে উদ্দেশ্যে তিনি এই সাত সকালে হন্ত-দন্ত হইয়া ডাক-ঘরে ছুটিয়া আসিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যটা এখন পর্যন্ত সফল হয় নাই। সুশীল মাস্টার খট খট করিয়া চিঠিগুলার উপর ছাপ মারিতেছে, এখনই ডাক বন্ধ হইয়া যাইবে।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া নরেশ কর কহিলেন: আচ্ছা দেখা হবে আর এক সময়, আসি এখন। বিশেষ কাজ আছে একটু, নমস্কার।

—নমস্কার।

নরেশ কর এক রকম ছুটিয়াই চলিয়া গেলেন। দলটি ততক্ষণে সেক্রেটারীর বাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িয়াছে।

গ্রাম: গ্রামের এইটাই যে সত্যিকারের রূপ—শুক্লা সে কথাটা কিছুতেই ভাবিতে পারে নাই যেন।

কলিকাতা—মহানগরী। নিজের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখে সমস্ত দেশের কেন্দ্র শক্তিটাকেই সে টানিয়া আনিয়াছে, কোনখানেই কিছু আর অবশিষ্ট রাখিয়া যায় নাই। দিক-দিগন্তে তাহার রাক্ষস বাহু বাড়াইয়া দিয়া দাবী করিতেছে—অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, মস্তিষ্ক। দুর্নিবার তাহার আকর্ষণে দিক-বিদিকের প্রাণশক্তি অন্ধের মতো সেখানে ছুটিয়া গেছে; এখানে রাখিয়া গেছে—ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, কুৎসা এবং কলঙ্ক।

মৃত্যু! দেহের মৃত্যু, আত্মার মৃত্যু। বর্ষা শেষ হইয়া যায়, ভাদ্রের ভরা জল কার্তিকে পচিয়া পচিয়া অস্বাস্থ্যকর বিষ-বাষ্পে গ্রামের

আকাশ বাতাসকে আবিল করিয়া তোলে। তারপর কলেরা সুরু হইয়া যায়। বাড়ীর পর বাড়ী উজাড় হইয়া চলে, হাতুড়ে ডাক্তারের পশার বাড়িয়া যায়। পোড়াইবার লোক জোটে না ; দিনের বেলাতেই দেখা যায়, খালের ধারে ধারে শিয়ালে মড়া টানিতেছে। যাহারা পলাইতে পারে, তাহারা পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়। তারপর মহামারীর ক্ষুধা ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া আসে—ইন্ধন থাকে না বলিয়া। পরিত্যক্ত ভিটাগুলি গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তে পড়িয়া পড়িয়া পচিতে থাকে, বেড়া ভাঙিয়া পড়ে, খুঁটির গোড়ায় উই ধরে, অবশেষে কোনো এক কাল-বৈশাখীর আঘাতে টিনের চালাটাও সশব্দে ধ্বসিয়া পড়িতে দ্বিধা করে না। কিন্তু সেখানেও শেষ নয়। ধীরে ধীরে সেই নির্জন ভিটাগুলির উপর জঙ্গল গজাইতে থাকে। সে জঙ্গল ঘন হইতে ঘনতর হয় এবং শেষ পর্যন্ত সাপের ভয়ে মানুষ আর সে দিকে পা বাড়াইতে পারে না। ভৌতিক অপবাদ বাড়ীটাকে অভিশপ্ত করিয়া তোলে ; রাত-বিরেতে অনেকে হয়তো দেখিতে পায়—অমানুষিক ছায়া মূর্তি, শুনিতে পায়—অস্বাভাবিক হাসির শব্দ ; অন্ধকার মধ্য রাত্রে কে যেন নারিকেল গাছের মাথা ধরিয়া ঝাঁকাইতে থাকে, ম্লান জ্যোৎস্নায় ঘোমটা দিয়া পাঁচ বছর আগে মরা ও বাড়ীর বড় বউয়ের মতো কাহার একটা মূর্তি খালের ঘাটে নামিয়া আসে। পিছনের বাঁশ বনে কাহারা যেন বাঁশে বাঁশে পিটাইয়া একটা অস্বাভাবিক শব্দ জাগাইয়া তোলে।

আর মন! জীবনে যাহাদের বৈচিত্র্য নাই, নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই যাহাদের পঙ্গু মন ফেনাইতে থাকে, তাহাদের কাছ হইতে মানুষ কতটুকু কী-ই বা আশা করিতে পারে! নগর-জীবনের এলোমেলো যে এক এক টুকরো আলো এখানে আসিয়া ছিটকিয়া পড়ে, তাহাতে ইহারা চোখে দেখিতে পায় না, ইহাদের চোখে তাহাতে ধাঁধাঁ

লাগিয়া যায়। সহরে যে নূতন কাপড় পরিবার ভঙ্গীটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, অনন্যসাধারণ অনুকরণী প্রতিভার বলে গ্রামের ছেলেরা তিন-দিনেই সেটি আয়ত্ত করিয়া বসে, নিউকাট জুতা বা নূতন ছাঁটের জামা আমদানী হইতে মাত্র পনরো দিন সময় লাগে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পত্রিকার বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া ইহারা যৌনবিজ্ঞান কেনে, পলিটিক্সের দু' একটা সস্তা বুলি মুখস্থ করে, অবসর সময়ে নতুন নাটকের রিহার্সাল চালায়। নৈতিক চরিত্রের পবিত্র আদর্শে গ্রাম উজ্জ্বল—দূর হইতে এই যে একটা কথা প্রবাদের মতো হইয়া আছে, তাহা যে কতখানি মিথ্যা, গ্রামে আসিলে সেটা প্রমাণ হইতে পাঁচ মিনিটও সময় লাগে না। অর্থের অভাবে অবিবাহিতা কুমারী মেয়ের দল যেখানে ঘরে ঘরে বাড়িতে থাকে এবং শিস দিয়া আড্ডা জমাইয়া বেড়ানো ছেলের দল যেখানে অপর্যাপ্ত, সেখানে নৈতিকতার তথাকথিত মানদণ্ড কোন্ দিকে যে কতখানি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশি করিয়া বলিতে যাওয়া নিরর্থক।

গ্রামের মধ্যে একান্ত হিতকর এবং প্রয়োজনীয় যে এক-আধটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলিকে লইয়াও ক্ষুদ্রতার অবধি নাই। দরকার হইলে ভদ্রতা সংযমের মুখোস এক মুহূর্তে খুলিয়া ফেলিয়া হাতাহাতি করিতেও ইহারা দ্বিধা করেনা।

—বল কি হে, রমেশ চৌধুরী হবে এবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট? ব্রজবিহারী দাদা, তুমি বেঁচে থাকতেই গাঁয়ের মধ্যে এতবড় অঘটনটা ঘটবে? মুখুয্যেদের শাদা মুখ তিনদিনেই তা হলে কালো হয়ে যাবে যে।

সুতরাং ব্রজবিহারী দাদার ঘুমন্ত পৌরুষ খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো এক মুহূর্তে সজাগ হইয়া ওঠে। সুখটান দিবার জন্য যে হুঁকাটা

তিনি হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহার প্রলোভনও যেন গৌণ হইয়া আসে। মনের ভুলে সেটাকেও তিনি পাশের লোকটির দিকেই বাড়াইয়া দেন।

—হুঁঃ তুমিও যেমন! এসব শোনো কার কাছে? বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু ব্রহ্মরক্ত এখনো ঠাণ্ডা হয়নি হে। মুখুয্যেদের সমস্ত তালুকদারিই যদি বন্ধক দিতে হয়, তবুও এমনটা হতে দেবনা। শূদ্দুরের টাকার জোর হয়েছে! ও অহঙ্কারের পয়সা ক'দিন থাকবে? আমি পৈতে ছুঁয়ে বলতে পারি—

কী বলিতে পারেন, তাহা নূতন করিয়া বলার দরকার নাই। এ ইতিহাস গতানুগতিক—বার বার করিয়া বলার হয়তো নয়; কিন্তু গ্রামের দিকে একবার চোখ মেলিয়া চাহিলেই এই পুরাতন, অতি পুরাতন সত্যগুলিও অত্যন্ত নির্মমভাবে দৃষ্টিকে আহত করিতে থাকে। নূতনত্ব হয়তো নাই, হয়তো নূতন করিয়া শোনানোটা ক্লান্তিকর: কিন্তু ক্লান্তিকর হইলেই এ সত্যকে আজ আর কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন রাখা চলিবে! যন্ত্র-চক্র মুখরিত নাগরিক জীবন, বিদ্যুতের রূপসজ্জা, সিনেমার রূপালি পর্দায় স্বপ্নিল জীবনের বহু বর্ণিল প্রতিবিম্ব! কিন্তু সেই পর্দার পিছনে যুগ-যুগান্তের অন্ধকার খা-খা করিতেছে। আশা নাই, আলো নাই, প্রতীকারও হয়তো নাই। সবাই জানে; এত বেশি করিয়াই জানে এবং এত বেশি করিয়াই শুনিতে পায় যে, সেজন্য এতটুকু কিছু করিতে যাওয়াও আজ অনাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রামের এই সম্পূর্ণ রূপটাকেই কয়দিনে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিল শুক্লা। বিস্মিত হইল, আঘাত পাইল, সাময়িকভাবে সেন্টিমেন্টে খানিকটা অলোড়নও জাগিল হয়তো। কিন্তু অতি স্বাভাবিক ভাবেই সে আলোড়ন গেল স্তিমিত হইয়া। বেদনাটা

হইল কৌতূহল এবং কৌতূহল পার হইয়া খানিকটা কৌতুক জাগিয়া রহিল শুধু।

আরে কৌতুক ছাড়া কী-ই বা সে বোধ করিবে। গ্রামে সে কখনো থাকে নাই; জন্মিয়াছে পাটনায় এবং মানুষ হইয়াছে কলিকাতাতে। তাহার বাবা অ্যাকাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টে কি একটা প্রকাণ্ড চাকরী করিতেন। কর্মজীবনটা তাঁহার দেশের বাহিরে বাহিরেই কাটিয়াছে। সুতরাং দেশের সম্বন্ধে সত্যিকারের কোন একটা ধারণাই শুক্লার মনে খিতাইতে পারে নাই। দেশ সম্পর্কে আবছা-আবছা যতটুকু শুনিয়াছে, তাহাতে শুধু স্বপ্নই জমিয়া উঠিয়াছে, বাস্তবের কল্পনা আসে নাই।

আর তা ছাড়া দেশ সম্বন্ধে ভাবিবার কতটুকু অবকাশই বা তাহার ছিল! সংস্কৃতি—শিক্ষা—আলোকপ্রাপ্ত সমাজজীবন। দেশের গ্রামের এতটুকু খবর না রাখিলেই বা তাহার কি ক্ষতি হইতে পারিত! কিন্তু নানা কারণে দেশের সংস্রবে তাহাকে আসিতে হইল। বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জে বাড়ী রাখিয়া বাবা মারা গেলেন, ব্যাঙ্কে যাহা রাখিয়া গেলেন—এক পুরুষ ধরিয়া অজস্র পরিমাণে অপচয় করিবার পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত। জীবনের সুনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে চোখ রাখিয়া শুক্লা কলেজের ধাপগুলি ডিঙাইল। তারপর পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে যখন ঢুকিয়াছে, তখন কী কুক্ষণেই একদিন টালিগঞ্জের মশা তাহাকে কামড়াইল।

সেই যে কামড়াইল, সেই হইতেই জর। ছাড়িল যখন, তখন আর বস্তু রাখিয়া গেলনা। পাণ্ডুর চোখ-মুখ, শীর্ণ শরীর—ইন্‌ভ্যালিড-চেয়ারে করিয়া শুক্লাকে পুরীতে চালান করা হইল। তারপর গিরিডি, নৈনিতাল, ডেরাডুন এবং কার্শিয়াং ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত সে গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রামে তাহাদের এতবড় যে একটা বাড়ী আছে এবং তাহার কাকার

এখানে এমন প্রবল প্রতিপত্তি, এসব দেখিয়া সে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হইল।

ডাক্তারের কড়া নিষেধ : পড়ায় বই খুলিবার জো কী! অথচ শরীর সারিয়া উঠিয়াছে প্রায় নিঃসঙ্গ কর্মহীন দিনগুলি আর কাটিতে চায় না। প্রথম যখন সে গ্রামে আসিয়াছিল, তখন কলিকাতার বাহিরে বাংলার এই রূপটা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু তারপরেই সে মোহ কাটিয়া যাইতে দেরি হইল না। আর তা ছাড়া প্রতিদিনের অতি বাস্তব হীনতা, কলিকাতায় যাহার রূপ প্রসাধনের প্রখরতায় চাপা পড়িয়া যায়, তাহা এখানে এমন প্রকট হইয়াই উঠিয়াছে যে, শুক্লা রীতিমত ক্লান্ত বোধ করিতেছিল।

বিকালের সোনালি রোদ তখন বাগানের নারিকেল বীথিকে রাঙাইয়া দিয়া তাহার জানালায় আসিয়া পড়িয়াছিল। শুক্লা আর থাকিতে পারিল না। বাহির তাহাকে সত্যি সত্যিই যেন হাত বাড়াইয়া ডাকিতেছিল। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সে চুলটা একবার ঠিক করিয়া লইল, তারপর পায়ে জুতা আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পল্লীর অভিজ্ঞতায় এটা নূতন। তাদের বিচার-দৃষ্টির কাছে মার্জনীয়ও নয়। কিন্তু বাহির হইতে যারা আসে, এ নিয়ম তাদের পক্ষে খাটে না। আরও বিশেষ করিয়া শুক্লার মত মেয়ে—নিজের মূল্য সম্পর্কে যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত স[illegible]তন।

কিন্তু শুক্লার যাহাকে সব চাইতে বিশ্রী লাগে, সে কাকার মেয়ে নীলি; নামটা তাহার নীলিমা নামেরই অপভ্রংশ, কিন্তু অমন চমৎকার নামটার কী অপচয়ই না করা হইয়াছে এই মেয়েটার ঘাড়ে চাপাইয়া! নীলাম্বরী অথবা নীল-কাদম্বিনী গোছের নাম হইলেই ইহাকে মানাইত।

গ্রামের মেয়ে, বাড়ীতে খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়াছে, কিন্তু মনের দিক দিয়া যে কে সেই !

প্রথম দিনেই শুক্লা সেটা টের পাইয়াছিল।

বাইরে যাইবার পথে নীলি সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : কোথায় যাচ্ছ সেজদি ?

—রাস্তা থেকে ঘুরে আসব একটু। যাবি ? আয় না ?

কিন্তু তাহার নিমন্ত্রণের কোনো উত্তর না দিয়াই নীলি বলিয়াছিল : তাই বলে ওই জুতোটা পায়ে দিয়ে পথে বেরোবে নাকি ?

সন্দিগ্ধ হইয়া শুক্লা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : কেন, কী হয়েছে জুতোটার ?

নীলি সসঙ্কোচে বলিয়াছিল : না, জুতোটার কিছু হয়নি। তবে ওটা পায়ে দিয়ে রাস্তায়—

—তার মানে ?

শুক্লার মুখের ভাব ক্রমশ কঠোর হইয়া আসিতেছে দেখিয়া নীলি আরো সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল ; সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিল : লোকে যা তা বলবে।

—ও : !

প্রথমটা তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্য, তারপর স্নিগ্ধ কৌতুকের দীপ্তিতে শুক্লার চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল ; বলিয়াছিল : আচ্ছা, লোকের যা ইচ্ছে বলুক। কিন্তু তুই যাবি সঙ্গে ?

জড়োসড়ো হইয়া নীলি বলিয়াছিল : না সেজদি। মা এসব বেশি পছন্দ করে না। তা ছাড়া ও বাড়ীর জেঠিমা দেখলে—

—তোকে কপ্ করে খেয়ে ফেলবে, না ? আচ্ছা, থাক তুই, প্যাঁচার মতো মুখ করে তা হলে ঘরেই বসে থাক। থাইসিসে মরবার

জন্যেই তোরা জন্মেছিস,—বাইরের আলোবাতাস তোদের পছন্দ হবে কেন ?

চটিয়া হিল-তোলা জুতা ঠক ঠক করিয়া শুক্লা বাহির হইয়া গিয়াছিল। ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিয়াছিল দোতলার একটা জানালা দিয়া পশুর মতো ভীত অর্থহীন চোখে নীলি তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে—যেন এমন একটা অসম্ভব অবস্থ সে আর কোন দিন দেখে নাই! শুক্লার সঙ্গে চোখা-চোখি হইতেই সে সজোরে ঠাস করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ইঃ, লজ্জার বহরটা দেখ একবার! যেন মেয়ের শুভদৃষ্টি হইতেছে!

নীলির সম্বন্ধে শুক্লার সেই প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিল, চেষ্টা-চরিত্র করিলে সময়মতো মেয়েটাকে হয়তো শুধরাইয়া লওয়া যাইবে, কিন্তু দিন কয়েক নাড়াচাড়া করিয়াই বুঝিল অসম্ভব। দৈন্য তাহার যে শুধু শিক্ষার, তা নয়—তাহার সংস্কারের। এই গ্রাম আর এই রক্ষণশীল পরিবারের বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়া তাহার প্রতিটি রক্ত কণিকার যে সংক্রামক ব্যাধিটা ছড়াইয়া গিয়াছে, জন্মান্তর না ঘটিলে কোনোমতে সে রোগ সারিবার নয়।

নমুনার তাহার অভাব নাই।

বলিয়াছিল: দুপুর বেলা কি পড়ে পড়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোস! তার চাইতে আজ এই হাতের লেখাটা লিখে রাখবি, রাত্তিরে দেখে দেব, পারবি ?

—হুঁ, ঘাড়টাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হেলাইয়া নীলি বইটা লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু উৎসাহের সমাপ্তিও ওইখানেই ঘটিল।

সুতরাং দুপুরে ভোজনপর্ব শেষ করিয়া সে মুঠি ভরিয়া পান মুখের

মধ্যে পুরিয়া দিল, তারপর মেজেতে মাদুর পাতিয়া এবং ভিজা চুলের গুচ্ছ এলাইয়া দিয়া সটান হইয়া পড়িল। ঘুম যখন তাহার ভাঙিল, বেলা তখন বৈকালের দিকে গড়াইয়া গিয়াছে।

রাত্রে শুক্লা জিজ্ঞাসা করিল: লিখেছিস?

অপ্রস্তুতভাবে নীলিমা বলিল: কাল লিখব।

তারপর সেই কাল অনেক কালেই প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। লেখার সময় নীলি এ পর্যন্ত আর পাইয়া উঠিল না। এ সমস্ত বাজে কাজে দুপুরটা নষ্ট না করিয়া ও সময়ে পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইলে, আর নয়তো পাড়ার আরো তিন চারটি মেয়েকে লইয়া বিস্তি খেলিলে যে অনেক উপকার হইবে, এসম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহ ছিল না।

শুক্লা তাহাকে শুধরাইবে কী, শেষে এমন দাঁড়াইল যে, তাহাকে দেখিলে নীলি যে কোন্ পথ দিয়া ছুটিয়া পালাইবে, তাহাই ভাবিয়া পায় না। সে যেন তাহার কাছে মূর্তিমতী একটা বিভীষিকা হইয়া উঠিয়াছে। পড়াশুনা এমনিতে হইবেই না, অনর্থক মেয়েটাকে সদা সন্ত্রস্ত রাখিয়া বেচারার মনের শান্তি নষ্ট করিয়া লাভ নাই।

সুতরাং শুক্লা হাল ছাড়িয়া দিল। গ্রামের আরো পাঁচটি মেয়ে তাদের জীবনের যে পরিণতিটাকে অনিবার্যভাবে বরণ করিয়া লইয়াছে, নীলির ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম যদি না ঘটে, তবে সেটাকে অস্বাভাবিক মনে করার কারণ নাই। ইহাদের রক্তধারায় যে জন্মার্জিত সংস্কার চিরটা কাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিবার মতো মনের জোর ইহাদের যদি না থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রেই বা অভিযোগ করিয়া কী হইবে? সংশোধন করিবার সময় যদি উত্তীর্ণ হইয়াই গিয়াছে, তাহা হইলে রুদ্রের আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ছাড়া সে আর কী করিতে পারে?

কিন্তু শুধু মেয়েরা কেন, সমস্ত পরিমলটাই যে কী অস্বাভাবিক, কী নিশ্বাসরোধী, তাহার পরিচয় পাইতে শুক্লাকে তিনটি দিনও দেরী করিতে হয় নাই; তথাকথিত শিক্ষার দিক হইতে এ গ্রামটাকে একেবারে পশ্চাৎপদ বলা চলে না, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহাদের একদল কলিকাতার পথেঘাটে এবং দেশ-বিদেশে হা-ঘরের মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, একদল ঘরে আসিয়া বসিয়া আছে, কেহ পল্লী-সংস্কারে মন দিয়াছে, কেহ বা থিয়েটার পার্টির অনারারী সেক্রেটারী; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের মনোবৃত্তি সে এই স্তরেই নামিয়া আসিয়াছে, শুক্লা সেটা কল্পন। করিবে কী করিয়া!

পথে তো নামে নাই—যেন সে চিড়িয়াখানার একটা প্রাণী। যে দেখিল, সেইই চাহিয়া রহিল। আর সে কী দৃষ্টি! ভাষা দিয়া তাহার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

তারপরে গা সওয়া হইয়া গিয়াছে ইহাদেরও এবং তাহারও। এখন তাহাকে দেখিলে ইহারা নানা রকম ভাবের অভিব্যক্তি দেখাইয়া দেয়। বয়স্কেরা ভ্রূকুটি করেন, ছেলে ছোকরারা পরস্পরের দিকে চোখ টিপিয়া অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে। খাল, পুকুরঘাট বা আনাচ-কানাচ হইতে মেয়েরা যে দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন, সে দৃষ্টিও ঠিক বন্ধুভাবাপন্ন নয়।

মধ্যে মধ্যে নেপথ্য মন্তব্যও ভাসিয়া আসে।

—নিশি সেনের মেয়ে, না?

—তাই তো দেখছি। কলকাতায় থাকে, তিন চারটে পাশ দিয়েছে।

—বল কী। এত বড় মেয়ে, বিয়ে-থা দেবে না?

—আবার বিয়েও! বড়লোকের মেয়ে, হয় বিলেতে যাবে, নয়তো মাষ্টারনী হবে। ওদের আবার বিয়ের ভাবনা!

কিন্তু এগুলি বয়স্কাদের মতামত। এই বাসুদেবপুর গ্রামে বাহিরের রূপ রস-সমৃদ্ধ জগতের প্রাণ-স্পন্দন একেবারে যে ভাসিয়া না আসে, তাও নয়। তরুণী মেয়েরা তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাহার প্রত্যেকটি চাল-চলনকেই তাহারা মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে।

—দেখেছিস ভাই, কী সুন্দর ওর শাড়িখানা।

—রিগ্যাল শাড়ি, কলকাতায় নতুন উঠেছে। এবার পূজার সময় ওঁকে লিখে দেব—আমার জন্যে কিনে আনবেন একখানা।

তা ছাড়া সবই এখন একটু একটু করিয়া বদলাইতে সুরু করিয়াছে। গত বৎসর এই গ্রাম হইতে দুইটি মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে, বরিশাল কলেজে পড়িতে গিয়াছে তাহারা। গ্রামের যাহারা প্রগতি-পন্থী তরুণ, এ ব্যাপার লইয়া তাহারা রীতিমত গর্ব বোধ করে। তবুও এখনও যে ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রভাব এড়াইতে পারিল না, সেটাই বিসদৃশ লাগে শুক্লার কাছে।

তা যে যাহাই ভাবুক সেজন্য তো আর ঘরে বসিয়া বিকালটাকে মাটি করা চলেনা। শুক্লা পথে নামিয়া পড়িল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের উঁচু রাস্তা; এ অঞ্চলে গোরুর গাড়ি চলে না বলিয়া রাস্তার বুক ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায় নাই। দুই পাশে বাঁশ আর সুপারি নারিকেলের দীর্ঘছায়া। শুক্লা মন্থর গতিতে আগাইয়া চলিল।

গাঙ্গুলিদের চণ্ডীমণ্ডপ, রায়েদের দীঘি, বক্সীদের বাগান—আর কর মজুমদারের মঠগুলি পার হইয়া খালের পাশে পাশে পথটি মাহিলাড়ার দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; সেই পথ ধরিয়াই শুক্লা চলিতে লাগিল। গ্রামের সীমানা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাগান আর বন জঙ্গল হালকা

হইয়া গেল, এইবার দুপাশে অজস্র মাঠ। সবুজ নয়—শস্যহীন শীতের প্রান্তর, একটা রুক্ষশ্রী, চারিদিকে যেন খা-খা করিতেছে; কোথাও কোথাও সবুজের খানিকটা গাঢ় বিন্যাস, মটর কড়াইশুঁটি জন্মিয়াছে সেখানে। পথের একেবারে নীচেই খাল, শীতে তাহার দেহ সঙ্কীর্ণ, কোথাও কোথাও কচুরি পানার দুর্ভেদ্য স্তর নৌকার গতি একেবারে রোধ করিয়া আছে—তারপর বামে চাও, দক্ষিণে চাও—মাঠ; মাঠ; সীমানাহীন মাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। দক্ষিণে অনেক দূরে—প্রায় চক্রবাল-রেখার কাছে এক টুকরা গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, ওই গ্রামের নাম পিপলাকাঠি। ওখান দিয়া নদী মস্ত একটা বাঁক ঘুরিয়াছে। কিন্তু এতদূর হইতে নদীটা দেখা যায় না, শুধু মনে হয় সবুজ মাঠের ভিতর দিয়া গোটা-কয়েক ছোট বড় শাদা পাল বকের মতো ভাসিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু অন্যমনস্কের মতো চলিতে চলিতে শুক্লা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল।

নির্জন পৃথিবী, প্রশান্ত পরিমণ্ডল। তাহার মাঝখানে কোথা হইতে স্পষ্ট গানের সুর তাহার কানে ভাসিয়া আসিল। যে গাহিতে-ছিল, সে সুগায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার গানের অর্থ—

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া শুক্লা চাহিল। খানিক দূর সম্মুখেই খাল হইতে ছোট একটি নালার মতো বাহির হইয়া গিয়াছে, সেই নালাটির একপাশে কয়েকঘর নিম্নশ্রেণীর লোকের বসতি। নালার উপরে একটি ছোট কাঠের সাঁকো, তাহারি উপর দাঁড়াইয়া জন তিনেক ছোকরা জটলা করিতেছে। তাহাদেরই একজন আড়চোখে শুক্লার সর্বাঙ্গে নোংরা ক্ষুধিত দৃষ্টি বুলাইতেছে এবং সেই সঙ্গে গান জুড়িয়া দিয়াছে।

বিরক্তিতে, ক্রোধে এবং লজ্জায় শুক্লার মুখ কালো হইয়া উঠিল। মোটা কোলা ব্যাঙের মতো ছোকরার চেহারা, কুৎকুতে চোখ দুইটা তাহার লোভে চকচক্ করিতেছে। আর সে গান! এতটুকু শালীনতা বোধ থাকিলেও এমন অশ্লীল কথা মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারেনা। আর এ গানের লক্ষ্যবস্তুও যে কে, সেটা অনুমান করিতেও তাহার দেরী হইল না।

রাগে তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া পায়ের জুতাজোড়া খুলিয়া গায়ক ছোকরাকে রীতিমত অভ্যর্থনা করিয়া দেয়। হতভাগারা তাহাকে কী ঠাওরাইয়াছে। কিন্তু সাহস হইল না। চারিদিকে আর জনমানুষ নাই, গ্রাম হইতে আধ মাইল পথ সে পার হইয়া আসিয়াছে। এখানে ইহারা যদি তাহাকে অপমান করিয়াই বসে, তাহা হইলে একা সে ইহাদের সঙ্গে কী করিতে পারিবে।

শুক্লা কথা কহিল না; সোজা ফিরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল। অপমানে তাহার চক্ষু দিয়া জল আসিবার উপক্রম করিতেছে। আচ্ছা, দেখিয়া লইবে। কাকাকে খবরটা একবার দিলেই শায়েস্তা হইয়া যাইবে সব। তাহাকে চেনে নাই এখনও।

কিন্তু শুক্লাও তাহাদের চেনে নাই। তাহারা যথাক্রমে টোনা, রসময় এবং শশিকান্ত।

বড় বড় পা ফেলিয়া শুক্লা চলিয়া গেল। বাঁশবনের আড়ালে আড়ালে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার শাড়ির আঁচল দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ ইহারা নির্নিমেষ চোখে চাহিয়াই রহিল।

টোনা বিভোর হইয়া গিয়াছিল। অর্ধ-নিমীলিতভাবে সে ততক্ষণ গাহিয়াই চলিয়াছে—

যৌবনেরি গাঙে আমার ঢেউ লেগেছে সই,
নাগর বিনে প্রাণ বাঁচেনা, কেমন ক'রে রই লো!
কেমন ক'রে রই!

রসময় কহিল, থাম্ থাম্। কিন্তু ও মেয়েটা কে বল্ তো রে? আগে তো দেখিনি।

টোনা চোখের একটা ভঙ্গি করিয়া কহিল: কে জানে! কিন্তু খাসা মেয়ে রে।

শশিকান্ত এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল, তোরা একেবারে ষাঁড় হয়ে গেছিস। মানুষ তো চিনিসনে, ও কি কাণ্ডটা করলি বল তো—

দুইজনেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। টোনা কহিল: কে ও!

—বড় বাড়ীর মেয়ে, বুঝলি? কলকাতায় থাকে, তিনটে পাশ দিয়ে চারটে পাশের পড়া করছে।

কলিকাতায় থাকুক বা চারিটা ছাড়াইয়া দশটা পাশের পড়াই পড়ুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সত্যি সত্যিই বড় বাড়ীর মেয়ে নাকি? সর্বনাশ। কাজটা তো তাহা হলেই অন্যায় হইয়া গিয়াছে।

রসময় চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল: বলিস কিরে!

টোনা সভয়ে বলিল: পথে বসিয়েছে একেবারে। ওটা যে বড় বাড়ীর মেয়ে, একথা আগে বলতে তোর কী হয়েছিল? রঙ-চঙে কাপড় আর চাল-চলন দেখে আমি ভাবলুম বা উল্টো চণ্ডীর মেলায়—

রসময় কহিল: থাক, থাক, কী ভেবেছিস—তা আর বলে দরকার নেই। শশেই বা তখন চুপ করে রইলি কেন? এখন যদি এ খবর রামু সেনের কানে যায়, তা' হলে—

টোনা শুকনো গলায় বলিল: যা ডাক-সাঁইটে লোক, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবে, আর নয়তো চালা কেটে ঘর তুলে দেবে।

না, শশিকান্ত বলে নাই, ইচ্ছা করিয়াই বলে নাই। রাসমোহন সেন কবে যে টোনার চালা কাটিয়া তুলিয়া দিবে, অথবা মারিয়া হাড গুঁড়া করিয়া ফেলিবে, সে একান্ত আগ্রহে সেই শুভ দিনটির জন্তই প্রতীক্ষা করিতেছে। আস্পর্ধাখানা দেখ একবার। একেই তো সমস্ত বৈরাগী পাড়াটা চাখিয়া বেড়াইতেছে, ইহার পর আবার ভদ্র-লোকের মেয়ের দিকে নজর! আর সে-ও যে-সে ভদ্রলোক নয়, স্বয়ং রাসু সেন—জোয়ান বয়সে যে লোক লাগাইয়া আড়িয়লখাঁয় ডাকাতি করাইত। খবরটা এককার তাহার কানে পৌছিলে সে কী-না করিতে পরে। হয়তো ছ'নলা বন্দুকটা বাহির করিয়া দুম্ দুম্ শব্দে গোটা দুই বুলেট ঝাড়িয়া দিবে, আর ব্যস্! সেই সঙ্গেই টোনার ঘোড়ার মতো চিঁহি চিঁহি করিয়া চেঁচানো কিংবা লোকের আদাড়ে-পাঁদাড়ে মেয়ে শিকার করিয়া বেড়ানোটা চিরদিনের জন্তই বন্ধ হইয়া যাইবে।

ঠাট্টা করিয়া কহিল: আছিস পাঁচী আর ফুটকিকে নিয়ে—তাদের নিয়েই থাক। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবার সখ কেন বাপু?

এদিকে শুক্লা সেই যে বড় বড় পা ফেলিয়া চলিয়াছিল, পুরা আধ মাইল পথ ডিঙাইয়া তাহার গতি শান্ত হইয়া আসিল। ততক্ষণে অজস্র মাঠের বাতাস এবং পৃথিবীর বুকের উপর তন্দ্রার মতো প্রসারিত স্নিগ্ধ শান্তি তাহার মনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে; এপাশে সবুজ অরণ্যের মধ্যে পাখী ডাকিতেছে—বাতাসে শির শির করিয়া পাতা কাঁপিতেছে, আকাশের রঙ উজ্জ্বল নীল। শুক্লার মানসিক প্রবণতা অনেকখানি সংযত হইয়া আসিয়াছিল। নাঃ, ছিঃ, এসব কথা কাকার কাছে সে বলিবে কী করিয়া? নিজের সম্মান যদি সে নিজেই

না রাখিতে পারে, তবে সে জন্য যাহা কিছু অগৌরব, তাহারই। তা ছাড়া কাকিমা যে কীভাবে সদুপদেশ বর্ষণ করিবেন এবং আড়ালে আড়ালে নীলি যে কীভাবে মুখ টিপিয়া হাসিবে, সে কথা সে এখনই বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারিতেছে।

যাক; তাহার চাইতে ব্যাপারটা একেবারে চাপিয়া যাওয়াই ভালো। ভবিষ্যতে ওদিকে আর বেড়াইতে না গেলেই চলিবে। আর ওরাও যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গান গাহিতেছিল, একথাই বা সে মনে করে কী করিয়া? এমনও তো হইতে পারে যে, ব্যাপারটা নিছক যোগাযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তবু মনের দিক হইতে সান্ত্বনা মিলিতেছে না।

—নমস্কার!

চকিত হইয়া শুক্লা চোখ তুলিয়া চাহিল এবং যাহার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, সে তপন। গ্রামে এই একটি মাত্র ব্যক্তি—এতদিনে যাহার সঙ্গে শুক্লার অন্তরঙ্গতা ঘটিতে পারিয়াছিল। তপন তাহাদের প্রতিবেশী, দূর সম্পর্কের কি রকম জ্ঞাতিও বটে। সেই সূত্রেই বড় বাড়ীতে তাহার যাতায়াত ছিল এবং শুক্লার সঙ্গে পরিচয় সম্ভব হইয়াছিল।

তপন কবি। পরিহাস করিয়া বলা নয়—সত্যি সত্যিই তাহার মধ্যে যে একটা নিজস্ব কবিপ্রাণ আছে, সেটা যখন তখন প্রকাশিত হইয়া পড়িত। নিজের সম্বন্ধে সে সচেতন নয়, শিশুর মতো সরল, অসম্ভব খেয়ালী। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা শ্রেণী অবধি উঠিয়া তাহার মনে হইল, ইহার চাইতে বেশি একটানা পড়াশুনা করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব পাঠ্য বইগুলি দুহাতে বিতরণ করিয়া দিয়া সে আর্টস্কুলে গিয়া ভর্তি হইল। কিন্তু সেখানে গিয়াও তাহার মনে হইল

প্রতিভা অপেক্ষা অনুকরণের আদর এখানে বেশি। 'দুত্তোর' বলিয়া সে তুলিটাকে রাস্তায় নিক্ষেপ করিল, রঙের বাটিগুলি উবুড় করিয়া ফেলিল, ক্যান্‌ভাস্‌টাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিল এবং ইজেলটাকে আছড়াইয়া শেষ করিয়া দিল। বাহিরে আসিয়া কহিল, অনেক দিন ধরে কুঁদে কুঁদে ছবি আঁকবার চেষ্টা করে সমস্ত শরীরটাই প্যারালাইজ্‌ড হয়ে গিয়েছিল। এই ফাঁকে একটু ব্যায়াম করে নেওয়া গেল।

তার পর হইল নিরুদ্দেশ। আত্মীয়-স্বজনের অনেক অনুসন্ধান করিয়া যখন তাঁহার খোঁজ পাইলেন, তখন দেখা গেল, বোম্বাইয়ের এক কাপড়ের কলে শ্রমিকের মিটিং জমাইয়া সে তাহাদের ধর্মঘট করিবার উপদেশ দিতেছে। সেখান হইতে তাহাকে বাড়ীতে ধরিয়া আনা হইল। দেশোদ্ধারের স্পৃহা তপনের ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছিল, সকলে বলিলেন: দিন কয়েক পড়াশোনা ক'রে 'ল'-টা দিয়ে দে।

তপন চোখ পাকাইয়া কহিল: 'ল'! 'ল' পড়ব কি? Every law is unlawful! তা নয়—I must be a builder of the future society, নোয়াখালির একটা ইস্কুলে হেড মাস্টারি পেয়েছি, সেইখানেই চললুম।

সকলে সবিস্ময়ে কহিলেম: হেড মাস্টারি! কেন তোর কি ঘরে খাওয়ার অভাব আছে যে, কোন্ সাত-সমুদ্দুর পারে নোয়াখালিতে হেড মাষ্টারি করতে যাবি?

—খাওয়ার অভাব! দুত্তোর! তপনের মধ্যে বক্তা জাগিয়া উঠিল। উদ্দীপ্তভাবে বলিল: 'Tis not my profession but a sacred duty. I will make my every student a man with iron muscles and iron nerves, liberated from all conventions —from all social prejudices—

আত্মীয়-স্বজনেরা অত কড়া কড়া ইংরেজি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন : যা ভালো বোধ, কর বাপু। বয়স তো আর কম হয়নি, এ বয়সেও যদি এরকম ছেলেমানষি কর, তা হলে আমরা আর কী বলব।

তপন কহিল : বটে। বুড়ো হয়ে গেছি? তারপর শান্তি-নিকেতনের সুরে গান ধরিল :

"আমাদের পাকবেনা চুল গো, মোদের
পাকবেনা চুল।
আমাদের ঝরবেনা ফুল গো, মোদের
ঝরবেনা ফুল।
আমরা ঠেকবনা তো কোন শেষে
ফুরয় না পথ কোনো দেশে রে"—

আত্মীয়-স্বজনেরা চাহিয়াই রহিলেন। তপন টেবিল বাজাইয়া গান শেষ করিল :

"আমাদের ঘুচবে না ভুল গো, মোদের
ঘুচবে না ভুল।"

সুতরাং ইহার পরে আর কথা চলে না। তাঁহারা সংক্ষেপে কহিলেন পাগল এবং তপনের সংশোধনের আশা ছাড়িয়া বিদায় লইলেন।

তপন নোয়াখালি গেল এবং অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াই গেল। কিন্তু ফিরিতে তাহার দশটি দিনের বেশি দেরী হইল না। অঙ্কের ক্লাশে সমস্ত ছাত্রদের একত্র করিয়া যখন সে 'জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে' কোরাসে শিখাইতেছিল, তখন সেক্রেটারী সেখানে আসিয়া জুটিলেন।

সেক্রেটারী লোকটি রায় সাহেব। প্রথম জীবনে মোক্তারি করিয়া

বিলক্ষণ পয়সা রোজগার করিতেন, সম্প্রতি কয়েকটা স্বদেশী মামলায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়া রায় সাহেব উপাধি পাইয়াছিলেন। এই উপাধিটির মর্যাদা যাহাতে কোনরকমে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে তাঁহার কড়া নজর।

আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন: ছেলেদের ও কী গান শেখাচ্ছেন মাস্টার মশাই ?

তপন বিশুদ্ধ আভিধানিক ভাষায় জবাব দিল: এটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিরচিত একটী জাতীয় সঙ্গীত।

রায় সাহেব সভয়ে বলিলেন: না মশাই, এখানে ওসব চলবে না। তা ছাড়া অঙ্কের ক্লাশে আপনি গান শেখাচ্ছেন, এই বা কি রকম কথা ?

তপন উত্তর দিল: আমার কাজ আমি জানি। সে বিষয়ে আপনি উপদেশ না দিলেই আমি বাধিত হব।

কথায় কথা বাড়িল। মাত্রা যখন একটু বেশি পর্দায় চড়িয়াছে, তখন তপন সেক্রেটারীর দাড়ি ধরিয়া তাঁহার দুই গালে বেশ করিয়া চড়াইয়া দিল—ব্যস! চাকরী তো গেলই, ফেণীর আদালত হইতে ক্রিমিন্যাল এ্যাসলটের জন্য কুড়ি টাকা ফাইন দিয়া সে নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু তপনের চরিত্রের এটা একটা দিক হইলেও এইটাই সব নয়। ইহার মধ্যেই তাহার কবি-প্রাণ নিঃশব্দ ধারায় ফল্গুর মতো বহিয়া যাইত। সে কবিতা লিখিত—কিন্তু সে রচনাকে বাহিরের আলোয় মুক্তি দিবার প্রলোভনে নয়। গ্রামের লোক তাহাকে চিরকাল খেয়ালী ক্ষ্যাপা বলিয়াই জানিত, বাহিরের জগতে যেমন কেউ কখনো কোনো কাজের জন্য নিমন্ত্রণ করে নাই, তেমনি সে নিজেও কখনো যাচিয়া দশজনের সঙ্গে মিশিতে যায় নাই। তাহার জগৎকে সে নিজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত

করিয়া লইয়াছিল। ভাবপ্রবণ, তীক্ষ্ণ, তীব্র—সময়ে সময়ে অস্বাভাবিক আত্মবিস্মৃত, কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত আত্ম-সচেতন।

শুক্লা তাহার পরিচয় পাইয়াছিল, এবং সেই সঙ্গেই এই খেয়ালী কবি মানুষটিকে চিনিয়া নিতে তাহার দেরী হয় নাই। এমন হিসাবী এবং বে-হিসাবী, এমন আসক্ত ও অনাসক্ত সে আর জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। তাই নিজের অজ্ঞাতেই তাহার তপনকে ভালো লাগিত সুরু হইয়াছিল।

কিন্তু এই মুহূর্তে তপনকে হঠাৎ নমস্কার করিতে দেখিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল। কহিল: ব্যাপার কী, হঠাৎ এমন ঘটা করে নমস্কার করছ যে?

তপন কহিল: এমনি, হঠাৎ অনুপ্রেরণা পেলুম। যে-রকম ভয়ঙ্কর গম্ভীর মুখ করে বড় বড় পা ফেলে হেঁটে আসছিলে, তাতে নাম ধরে ডাকলে শুনতে পাবে কি না, সে সম্বন্ধে সংশয় ছিল। তাই ভাবলুম, অভিবাদন জানিয়ে দেখা যাক দেবী প্রসন্না হন কিনা!

—বাংলা নাটকের ভাষা হুবহু মুখস্থ করেছ দেখছি!

তপন অট্টহাসি করিয়া উঠিল। বলিল: মুখস্থ না করে কী করি; তোমরা মেয়েরা বাইরে যত বেশী রিয়্যালিস্টই হও না কেন, মনের দিক থেকে সেই নাটকের যুগেই চিরকালটা রয়ে গেলে।

শুক্লা প্রতিবাদ করিয়া বলিল: ইস্, কক্ষনো না। ও কথাটা জোর করে তোমারাই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ।

—তোমরা নিজেরাও কোনোদিন এর প্রতিবাদ করতে পারো নি।

—সেও তোমাদের জন্যেই। আমাদের অবস্থা হয়েছে কী জানো? তোমরা আমাদের যেভাবে ভাবতে শিখিয়েছে, সেইভাবেই আমরা এতদিন ভেবে আসছি। তোমাদের চিন্তা চুরি করেই আমরা

অরিজিন্যাল, কিন্তু সে অরিজিন্যালিটি যে মেয়েদের পক্ষে কতবড় অগৌরব আর কতখানি মিথ্যা তা বোঝবার সময় আমাদের আজো আসে নি। তোমরা টায়র্যাণ্ট, তোমরা অত্যাচারী, ঘরে-বাইরে আমাদের অপমান ক'রে বেড়াও।

শুক্লার চোখে জল ছল ছল করিয়া আসিল।

তপন হতবুদ্ধি হইয়া গেল: কী ছেলেমানুষ, এতেই কেঁদে ফেললে নাকি? ব্যাপারটা কী বল তো? আজ তুমি নিশ্চয়ই 'মুডে' নেই।

গানের কথাটা শুক্লার মনের মধ্যে তখন তীক্ষ্ণ হইয়া বাড়িতেছে, আসলে সেই অপমানটাই তখন অন্তরের-প্রত্যন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেটা তৎক্ষণাৎ যে মনে পড়িয়াই গেল, তাহা নয়,—বাহির হইবার জন্য একেবারে ঠোঁট অবধি আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু সে সামলাইয়া নিল, প্রকাশ করাটা তাহার নিজের কাছেই বিসদৃশ এবং অসম্মানজনক বোধ হইল।

শুক্লা চট করিয়া চোখটা মুছিয়া ফেলিল: না ও কিছু না। চোখে কী একটা পড়েছিল বোধ হয়।

তপন মাথা নাড়িয়া কহিল: মিথ্যে বললে।

—বললে বললুম। সব কিছুর জন্যেই তুমি কৈফিয়ৎ দাবী করবে নাকি?

তপন হাসিয়া বলিল: না, অতখানি কর্তৃত্ব ফলাবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার নেই। কিন্তু আজ এত সকাল সকালই ফিরে চলেছ যে?

—এমনিই। মাঠের দিকটা ভালো লাগল না। তার চাইতে এসো এখানে—বসে খানিক গল্প করা যাক! চমৎকার কিন্তু এই কাঠের পুলটা, না? দেখেছ, নীচ দিয়ে কী রকম জল বয়ে যাচ্ছে!

দুইজনে পুলের উপর পা ঝুলাইয়া বসিল। এটা চলাচলের পথ বটে, কিন্তু সাধারণত এ পথে মানুষ-জনের খুব বেশি আনাগোনা নাই। দুই দিকে বাগান, কাছাকাছি অনেকটার মধ্যে কোনও গৃহস্থের বসতি নাই। পৃথিবীর উপর দিয়া বিকালের ছায়া, সেই ছায়া এখানে বাগানের আড়ালে আড়ালে আরো ঘন হইয়া আসিয়াছে।

নীচে খালের জল একটানা বহিয়া চলিয়াছে—জোয়ার আসিয়াছে এখন। হেমন্তের জোয়ার, তীব্র নয়—কিন্তু তবুও খালের মন্থর নির্জীবতায় খানিকটা নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। তর্ তর্ করিয়া সাদা ঘোলাটে জল চলিয়াছে। পুলের লোহার খুঁটির গায়ে ঘা লাগিয়া ছোট ছোট ঘূর্ণি ঘুরিতেছে। স্রোতে কচুরীর স্তর ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাদের মাথার উপর বেগুনী ফুলের গুচ্ছ বাতাসে তির্ তির্ করিয়া কাঁপিতেছে।

পকেট হইতে একটা সিগারেট কেস বাহির করিয়া তপন বলিল—মে আই? খেতে পারি তো?

অন্যমনস্ক অভ্যাস বশে শুক্লা কহিল: ইয়েস। তাহার দৃষ্টি তখন জলের দিকে নিবদ্ধ। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে দেখিতেছিল, জলে তাহার ছায়া পড়িয়া বিকালের ম্লান রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে কেমন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

পা দুইটিকে দোলাইতে দোলাইতে শুক্লা বলিল: আচ্ছা, এখন যদি আমি টপ করে জলের মধ্যে পড়ে যাই, তা হলে কী হয়?

অত্যন্ত অনাসক্তভাবে তপন বলিল: কী আবার হবে?

—সাঁতার জানিনে, ঠিক ডুবে মরব। এক মুহূর্তে পৃথিবী থেকে বুদ্বুদের মতো মুছে যাবে আমার চিহ্ন—আমাকে নিয়ে যদি কোনও বিরোধ থাকে, কোনো সমস্যা থাকে—

তপন বাধা দিয়া কহিল—তাদের কোনোটারই সমাধান হবে না।

শুক্লা ভ্রূ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

—যেহেতু এখান থেকে পড়ে গেলে তোমার চিহ্ন মোটেই বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাবে না। ওপর থেকে যা ঠাওরাচ্ছ, ব্যাপার আসলে তা নয়। জল এখানে খুব বেশি তো একবুক। লাভের মধ্যে খানিকটা নাকানি-চোবানি খাবে, আর এই শীতের সন্ধ্যায় হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি যাবে। তা ছাড়া আমি আছি, পৌরুষের খাতিরেও টেনে হিঁচড়ে তুলতে হবে।

শুক্লা হাসিয়া উঠিল: ও হরি, তাই নাকি? আমি ভাবছিলুম, না জানি কত জল! আচ্ছা জল না হয় বেশি না-ই থাকল, হঠাৎ হার্টফেল ক'রে বসতে পারি তো? তখন তুমি টেনে তুললেও তো কোনো লাভ হবে না।

তপন একটানে সিগারেটটাকে বারো আনি নিঃশেষ করিয়া কহিল, ও রকম হঠাৎ তা হলে পৃথিবীতে অনেক ঘটতে পারে। এক্ষুনি আকাশে একটা হিঙ্কেল এরোপ্লেন এসে বোমা ফেলে এই সাঁকোটা উড়িয়ে দিতে পারে, বিস্থবিয়াসের ইরাপশানে ইতালী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, ডিনামাইট বিস্ফোরণে জার্মেনীর সব বিমানের কারখানাগুলো নিশ্চিহ্ন হতে পারে; সুতরাং ও সব কল্পনা এখন থাকুক, তার চাইতে তুমি যদি একটা গান গাও—

—গান, এখানে? বরং তুমি একটা আবৃত্তি করো, শোনা যাক।

—কী আবৃত্তি করব?

—যা খুশি। রবীন্দ্রনাথ, শেলী, ব্রাউনিং, ব্রিজেস, হুইট্‌ম্যান, শিশির ভাদুড়ী, মায় নজরুল—

তখন সিগারেটটা দূরে ফেলিয়া দিল, জলের মধ্যে হিস্‌স্‌ শব্দ করিয়া সেটা নিবিয়া গেল। কহিল, তুমি তো গড় গড় করে দিশি-বিলিতী একরাশ নাম মুখস্থ বলে গেলে। কিন্তু এদের প্রত্যেকের কবিতা আবৃত্তি করায় আমার আলাদা মুড্‌ আছে, তা জানো? আমি বর্ষার দিনে পড়ি রবীন্দ্রনাথ, জ্যোৎস্না রাত্তিরে শেলী, ঝড়ের সময় ব্রাউনিং, ঘুমোবার আগে ব্রিজেস, কবিতা লিখবার আগে হুইট্‌ম্যান, আর সাবান মাখতে মাখতে তারস্বরে আবৃত্তি করি শিশির ভাদুড়ী। বাকী রইলেন নজরুল, সভয়ে স্বীকার করি, তাঁর কাব্য পড়বার মতো দম বা গলার জোর আমার নেই। এখানেই তোমার তালিকা শেষ হল—কাজেই এঁদের একজনের কবিতাও আপাতত তোমাকে শোনানো চলে না।

—আচ্ছা, শীতের বিকেলে কী কবিতা পড়ো?

তপন উৎসাহিত হইয়া কহিল, ডি, এইচ, লরেন্স। শুনবে? আবৃত্তি করব 'বিব্‌ল্‌স্‌' কবিতাটা?

—বিব্‌ল্‌স্‌? সেই কুকুরের কাহিনী তো? রক্ষা করো, তার চাইতে তোমার নিজের একটা কবিতা—

তপন গম্ভীর হইয়া বলিল—সে আমি আবৃত্তি করি রাত বারোটার পর, প্রতিবেশী শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের যাতে শান্তি ভঙ্গ না হয়, সেই জন্যে।

শুক্লা বলিল, তা হোক। এখানে এমন কোনো ভদ্রলোক কাছাকাছি নেই যে, তোমার আবৃত্তিতে তাঁর শান্তি ভঙ্গ হতে পারে। এক আমি আছি, তা ভয় নেই, এজন্যে আমি তোমার নামে পুলিস কেস্‌ আনব না।

তপন একবার চারিদিকে তাকাইয়া বলিল, হাঁ, এখানে লোকজন

নেই, বিকল্প সম্ভব। কিন্তু গদ্য-কবিতা বরখাস্ত করতে পারবে তো? ছন্দ মিলের বালাই আমি ছেড়ে দিয়েছি আজকাল।

শুক্লা খুশি হইয়া বলিল, বেশ, বেশ, এখন থেকে আমিও লেখার চেষ্টা করতে পারব। কলেজ ম্যাগাজিনে বার তুত্তিন দিয়েছিলুম, ছন্দ মিল যুৎসই নয় বলে ছাপেনি। আপদ যখন গেছে, তখন এর পর থেকে আবার নতুন উৎসাহে সুরু করা যাবে। জানো, কাব্য সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক আনন্দ-বর্ধন তাঁর 'ধ্বন্যালোক' বইতে কী ব'লেছেন?

তপন হাত জোড় করিয়া বলিল, ক্ষমা করো, তোমার মতো আমি সংস্কৃতে এম, এ, দিতে যাচ্ছি না। আমার ধারণা, যারা বেশি অলঙ্কার বোঝে, তারা এতটুকুও কাব্য বোঝে না।

শুক্লার বুদ্ধি-দীপ্ত চোখ দুইটি মননশীলতায় দীপ্ততর হইয়া উঠিল। খানিকটা আত্মগতভাবে সে বলিল, তোমার কথাটা কিন্তু ঠিক। জানো এক জায়গায় 'প্রকাশ-'কার মম্মট ভট্ট লিখেছেন—

তপন বলিল, আবার সংস্কৃত! আমাকে তাড়িয়ে ছাড়বে নাকি?

—তা হলে থাক থাক। তুমি বরং তোমার কবিতাই আবৃত্তি করো।

—অতি আধুনিক প্যাটার্ণের?

—নিশ্চয়। গোটা কয়েক কবিতা আমি নানা কাগজে পড়েছিলুম, কিন্তু মানে বুঝতে পারিনি। দেখা যাক, আবৃত্তি শুনে কোনো অর্থ বোধ করা যায় কি না।

তপন আবৃত্তি সুরু করিল,

মিশরের স্তিমিত অন্ধ-রহস্য পার হয়ে
কথা কও তুমি, হে স্ফীংক্‌স্।

অনেক তামাটে আকাশের গন্ধ-ভরা পিছল রাত্রে
যে কারাভাঁ চলে গেল মরু-বালুকা ডিঙিয়ে,—
ডিঙিয়ে কামরাণ আর কামস্‌কাট্‌কা
হনোলুলু আর তিব্বতের গর্ভবতী তুষার প্রান্তর ;
সেই সব ধূসর প্যাঁচার উষর প্রেম
ঘুমিয়ে রয়েছে লক্ষ বৎসরের 'মমি'র মধ্যে ;
আমাদের মনীষার জ্যোতিঃরেখা
কখনো কি পড়বে সেই সব প্যালিয়োলিথিদের গায়ে,
কখনো কি জেগে উঠবে সেই সব মৃত অজগর,—
হাজারো, হাজারো শতাব্দী আগে
যারা ঘুমিয়ে রয়েছে সিন্ধু-শকুনের ডিম খেয়ে
আত্ম-বিস্মৃত নার্শিসাসের মতো ?

বুঝতে পারলে তো ?

শুক্লা হাসিয়া কহিল, সাধ্য কী ! সমস্ত পৃথিবীর ভুগোল আর মিথলজী পুরোপুরি জানা দরকার—এত পাণ্ডিত্য ক'জনের থাকে। তা ছাড়া অর্থ সঙ্গতি—

—দরকার নেই, অবচেতনার ব্যাপার কিনা : কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল যে। চলো, ওঠা যাক্ এবারে।

দুইজনে উঠিয়া পড়িল। গ্রামের পথে পথে স্নিগ্ধ সন্ধ্যা। আজ তৃতীয়া—চাঁদ উঠিবে একটু দেরীতে। তাই গ্রামের উপর দিয়া ছায়ার মতো অন্ধকার বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। গৃহস্থের গোঁসাই ঘরে, তুলসী তলায় এখন একটি একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে, শীতের সায়াহ্নে

বাঁশবন আর বন জঙ্গলের মধ্য হইতে অনেকখানি ধোঁয়ার কুয়াসা আকাশে আসিয়া জমিতেছে। ম্লানায়মান দিনের আলোয় কর মজুমদারদের শ্মশানখোলায় চিতার উপর সাজানো পুরাণো মঠগুলিকে অস্বাভাবিক বিষণ্ণ ও করুণ দেখাইতেছে। যেন মৃত্যুর নিঃশব্দ গম্ভীর মূর্তি রূপ ধরিয়াছে ওদের মধ্যে। বেশ হিম পড়িতেছে এখনি, ইহারই মধ্যে মাথার চুলগুলি ভিজিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে শুক্লার।

তপন ধীরে-সুস্থে আর একটা সিগারেট ধরাইল।

শুক্লা অনুসন্ধিৎসুভাবে তপনের মুখের দিকে চাহিল, বলিল, আচ্ছা, তুমি কী মানুষ তপনদা! দেশশুদ্ধ লোক যখন সিগারেট ছাড়ছে, তখন তুমি বোধ হয় দৈনিক এক টিন করে সিগারেট পোড়াও।

তপন নির্লিপ্তভাবে বলিল, তা পোড়াই।

—কেন পোড়াও?

—মনের বিলিতীয়ানাটাকে পোড়াতে পারিনি বলে। মনের ভেতরটায় যেখানে আন্তরিকতার জায়গা নেই, যেখানে শুধু দেশ প্রেমের দোহাই দিয়ে বিড়ির ধোঁয়ায় থাইসিস্ টেনে আনাটাকে আমি ভণ্ডামি বলেই মনে করি।

শুক্লা উত্তেজিত হইয়া কহিল, তুমি বলতে চাও যে সবাই ভণ্ড?

তপন মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

শুক্লা কহিল, এটা কিন্তু আমার কথার জবাব হল না।

—আরো জবাব চাও?

—চাই বই কি। তুমি খেয়াল মতো সমস্ত দেশটার সম্বন্ধে যা নয়, তাই মন্তব্য করবে, আর সেজন্যে কোন কৈফিয়ৎ দেবে না? প্রত্যেক কথারই একটা দায়িত্ব আছে জেনো।

তপন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, জানি। কিন্তু তুমি যে সত্যি সত্যি দারুণ সিরিয়াস্ হয়ে উঠলে।

—উঠব না? দেশ তো শুধু তোমার নয়, সকলেরই।

তপনের মুখে এক-ধরণের বিচিত্র বিকৃত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি অন্ধকারে শুক্লা দেখিতে পাইল না, দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইত। কিন্তু তবুও ইহারি মধ্যে সে লক্ষ্য করিল, একটা ইঙ্গিতময় স্তব্ধতা যেন তপনের সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া নামিয়া আসিয়াছে।

—কী, কথা কইছ না যে?

তপন কথা কহিল। শুধু যে কথা কহিল, তাই নয়—যেন দাঁতের মধ্য হইতে চিবাইয়া সে হিংস্র নিষ্ঠুরভাবে কথাটা শেষ করিল: বলেছিলে দেশটা আমার নয়! কিন্তু আমার দুঃখও সেইখানেই। আজ যদি আমি এই দেশের ডিক্টেটার হতুম, তা হলে কী করতুম, জানো? এ দেশের সমস্ত শিক্ষা সংস্কার, আর সভ্যতার বনিয়াদটাকে ভেঙ্গে চুরে তচ্‌নচ্‌ করে দিতুম, আগুন লাগিয়ে দিতুম! I would turn a second Nero!

শুক্লা অস্বস্তি বোধ করিল, তাহার মনে হইল, তপন স্বাভাবিকতা হারাইয়া ফেলিতেছে। অতএব সমস্ত পরিবেষ্টনীটাকেই আবার সহজ করিয়া আনিবার জন্য সে পরিহাস-তরল লঘুস্বরে বলিল: সব পুড়ত, আর তুমি ছাতের ওপর বসে বাঁশি বাজাতে, না?

কিন্তু তপন সহজ হইতে পারিল না।

কহিল: না বাঁশি নয়, ড্রাম বাজাতুম, ব্যাটলড্রাম। তুমি তার বাজনা শোননি শুক্লা? সে এক অদ্ভুত উন্মাদ বাদ্য, তার তালে তালে মানুষের বুকের রক্ত থৈ থই করে নাচতে সুরু করে; তার আহ্বানে একজন অসঙ্কোচে আর একজনের হৃৎপিণ্ডে বেয়নেট বিঁধে দেবার জন্যে

এগিয়ে যায়; তার শব্দে আকাশে এরোপ্লেন ডানা মেলে দেয়, বোমার মুখে ছারখার করে দেয় নগর, গ্রাম; বিষাক্ত গ্যাসে কচি ছেলেকে মায়ের বুকের মধ্যে দম আটকে হত্যা করে, ফসলের ক্ষেত জ্বলে ছাই হয়ে যায়। আর অসহায় মানুষ আর্তচোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরুদ্দিষ্ট ভগবানকে অভিশাপ দেয়।

যে লঘু পরিহাস এবং কাব্য আলোচনার মধ্যে দিয়া বিকালের সমস্ত পরিমণ্ডলটা জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন কিসের একটা নিষ্ঠুর আঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে শতখান হইয়া গিয়াছে। তপন হঠাৎ চমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল: এই যে এসে পড়েছি। আশা করি, তোমাকে আর এগিয়ে দিতে হবে না, আচ্ছা চললাম—

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে পিছন ফিরিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

শুক্লা দোর গোড়ায় দাঁড়াইয়া পরম বিস্ময়ের সহিত তাহার গতি-পথের দিকে চাহিয়া রহিল, কথাটি অবধি কহিতে পারিল না।

অরণ্য

ইস্কুলের সেক্রেটারী রাসমোহন সেন। তাঁহার বাড়িতে আশ্রয় জুটিল প্রফুল্লের। গ্রামের ইস্কুলে সাধারণত এইটাই নিয়ম যে, বিদেশ হইতে যে সমস্ত মাস্টার এখানে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের বাড়ীতেই থাকিবার জায়গা পান, বেশির ভাগই ছাত্র পড়াইবার বিনিময়ে; আর যাঁহারা ভাগ্যবান, তাঁহাদের অনেক সময় এরকম দাসখত না লিখিয়া দিলেও চলে।

প্রফুল্লও সেই ভাগ্যবানদের দলে পড়িয়াছিল। রাসমোহন সেন গ্রামের নাম করা গৃহস্থ, এরকম বিনিময় প্রথা তাঁর সম্মানের পক্ষে গৌরবের নয়। আর তা ছাড়াও বাড়ীতে এমন একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে নাই, যাহার জন্য প্রফুল্লকে আশ্রয় দিবার কোনো অর্থনৈতিক সম্ভাবনা থাকিতে পারে। মেয়ের মধ্যে তো ওই এক নীলিমা, কিন্তু পড়াশোনার বাপারে মনের দিক হইতে সে কোনদিনই প্রবল একটা অনুরাগ গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। যতদিন দায়ে পড়িয়া পড়িতে হইয়াছে ততদিন পড়িয়াছে, লজেন্স মুখে পুরিয়া তুলিতে "গজঃ গজৌ গজাঃ" আর "সোলজার্স ড্রীম" মুখস্থ করিয়াছে; এবং যেই একটু সুবিধা পাইয়াছে, সরস্বতীকে কুলুঙ্গিতে চাবি বন্ধ করিয়া পরম আস্বস্তি সহকারে নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। রাসমোহন ইচ্ছা করিয়াই কিছু বলেন নাই।

গ্রামের সমাজ—মেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে, আর কয়দিন পরেই বিবাহ দিতে হইবে। সুতরাং বিদ্যা যা হইয়াছে, ইহার উপর আর ময়ূরপাখা না চড়াইলেও চলিবে।

সুতরাং প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত আরামে হাত পা মেলিয়া তাহার বসিবার ঘরটির দিকে চাহিয়া দেখিল। নীচের তলা হইলেও শুকনো খটখটে, কলিকাতার মতো মেজে হইতে ড্যাম্প উঠিবার ভয় নাই। বাহিরে চাহিলেই এখানে ইঁট পাথরের দুর্গে দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে না। সুপারীবন ডিঙাইয়া বাঁশঝাড়ের মাথার উপর দিয়া আকাশটাকে দেখিতে পাওয়া যায়—অজস্র, অপর্যাপ্ত, অন্তহীন। ঠিক জানালার পাশেই ঝুমকো জবার বড একটা ঝাড় উঠিয়াছে, তাহার ডাল জানালা গলাইয়া সোজা ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ডালটার মুখেই মস্ত একটা কুঁড়ি, কাল-পরশুর মধ্যেই ফুল ধরিবে সম্ভবত। প্রফুল্ল ডালটাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কতদিন ধরিয়া এই ঘরটার মধ্যে যে সে এইভাবে নিজের অধিকার বাড়াইয়া দিয়াছে—কে বলিবে, এত সহজেই তাহাকে অধিকারচ্যুত করা গেল না। ফুল না ধরা পর্যন্ত জানালাটা বন্ধ করা যাইবে না। দিন তিনেক একটু ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, তা একটা পর্দা টাঙাইয়া লইলেই চলিবে।

রাসমোহন আপ্যায়নের ক্রুটী করিলেন না।

—দেখুন তো, এ ঘরটাতে আপনার অসুবিধে হবে নাকি? নীচের তলা—প্রফুল্ল বাধা দিয়া সসঙ্কোচে কহিলঃ আজ্ঞে নীচের তলা বলে কী হয়েছে, তাতে আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

—ওপরেই ব্যবস্থা করতে পারতুম। আপনি তো এখন আমার ঘরের ছেলের মতোই। তবু ব্যাপারটা কী জানেন? নানারকম

লোকজন আসবে যাবে, বাড়িতে ছেলেমেয়েরা রয়েছে, ঘরেরও অভাব—

প্রফুল্ল আরও অপ্রস্তুত হইয়া বলিল: আজ্ঞে না, না; তাতে কিছু হয়নি। আমার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট।

—যাক, অসুবিধে না হলেই হল। তা এঘরটাও বেশ বড়ই আছে, একটু হাত পা মেলে চলাফেরা করতে পারবেন। দেওয়ালের গায়ে এই যে একটা কাচের আলমারী রয়েছে, দরকার হলে জিনিষ-পত্তর রাখতে পারবেন এখানে। এই টেবিলটাতেই বেশ কাজ চলে যাবে, কী বলেন? এ চেয়ারটাতে বসবেন না, একটা পায়া ভাঙা, টক্ করে পড়ে যেতে পারেন। আচ্ছা, আমি ওপর থেকে আর একটা ভালো চেয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি। চা খান তো? বেশ, বেশ, আমার বাড়ীতে আবার ও পাটটা একটু বেশি। আমার এক ভাইঝি আবার বেড়াতে এসেছে কিনা, দিনের মধ্যে পাঁচবার চা না খেলে তার মাথা ধরে যায়। সংস্কৃতে এম-এ পড়ছে, ওদের ধরণই আলাদা। তা হাতমুখ ধোয়া হয়েছে আপনার? ওঃ, জল দেয়নি বুঝি এখনো? আচ্ছা, দেখছি—

রাসু সেন তড়বড় করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রফুল্লের মনে হইল, লোকটি অনাবশ্যক রকমের ব্যস্ত মানুষ; কথাও বলিতে পারেন কম নয়, একবার আরম্ভ করিলেন তো কোথায় গিয়া যে থামিবেন, তাহা অনুমান করা শক্ত। তবু কয়েক মুহূর্তের পরিচয়ে দোষে গুণে লোকটিকে প্রফুল্লের মন্দ লাগিল না।

খানিক পরেই চা আসিল। শুধু চা-ই নয় আনুষঙ্গিক খাবারের ব্যবস্থাও বিলক্ষণ আছে। বিনয়ের মাত্রাটাকে রাসু সেন কোন্ পর্দায় যে তুলিয়া লইবেন, তাহা যেন ভাবিয়াই পান না!

—দেখুন, এমন জায়গা, চা-ও এখানে ভালো পাওয়া যায় না। এটা

অবিশ্যি খাঁটি দার্জিলিং টী, শুক্লা নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। তা ছাড়া আমার নিজের গোরুর দুধ, কণ্ডেন্সড্ মিল্কের চাইতে ভালো হবে নিশ্চয়ই, কী বলেন ?

প্রফুল্ল সবিনয়ে বলিল : আজ্ঞে তা তো বটেই। গোরুর দুধের মতো কি আর জিনিষ আছে।

ঠিক এই সময়ে সামনের দরজা ঠেলিয়া এক থালা খাবার লইয়া নীলিমা ঘরে ঢুকিল। পূর্ববঙ্গের মেয়ে, ব্যবহারের মধ্যে তাহার সঙ্কোচ খুব বেশি থাকিবার কথা নয়, তবু প্রফুল্লকে দেখিয়া বেশ খানিকটা দ্বিধাই যেন বোধ করিল সে। জড়িত পায়ে আগাইয়া আসিয়া সামনের টেবিলটার উপরে খাবারের থালাখানা নামাইয়া রাখিল।

প্রফুল্ল বিনয়ের মাত্রা আরও বাড়াইয়া বলিল, আহা-হা, এত সব আবার কেন ?

নীলিমা মৃদুস্বরে বলিল, খুব বেশি নয়, তারপর লজ্জাভীত দ্রুত গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইয়া আসিল বটে, কিন্তু চলিয়া গেল না। একেই তো পিতৃ-পিতামহের সংস্কারের ধারা-টাকেই উত্তরাধিকার সূত্রে টানিয়া টানিয়া একটা বিশেষ পরিবারের বিশেষ গণ্ডি-রেখার মধ্যে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে—সেই জন্য বাহিরের অ-দৃষ্ট জগৎটার সম্বন্ধে তাহার কৌতূহলের আর অবধি নাই ; তাহার উপর নীলিমার চরিত্রের যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ-মুক্ততা, হঠাৎ কেমন করিয়া যেন সেটা মস্ত একটা নাড়া খাইয়া বসিল। প্রফুল্লকে দেখিয়া হঠাৎ সে একটা বিজাতীয় লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। কেন যে এমন হইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না এবং পারিল না বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেল না, কবাটের আড়ালে আড়ি পাতিয়া রহিল।

রাসু সেন কহিলেন: আপনি তো একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। এখানকার ইস্কুলের ছেলেগুলো যা বাঁদর—সে আর বলবেন না। নিরীহ গো-ব্যাচারা মাস্টার পেলে তার একেবারে হাঁড়ির হাল করে ছাড়ে।

—তাই নাকি?

—হাঁ, শুনুন না ব্যাপারটা। আমাদের হেড পণ্ডিত মশায় বুঝলেন, একেবারে মাটির মানুষ। অমন লোক প্রায় দেখা যায় না। তা কখনো-সখনো ক্লাশে মাঝে মাঝে ঝিমোন, বয়স-দোষে অমন এক-আধটু হয়েই থাকে। তাঁর কী করেছে জানেন? টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে যেই একটু আরাম করতে গেছেন, অমনি পেছন থেকে কাঁচি দিয়ে—ব্যস, কচ।

—মানে টিকি কেটে নিয়েছে?

—আবার কী?

প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিল।

কী চমৎকার হাসিতে পারে সে! নীলিমা মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রাণের সমস্তটুকু উজাড় করিয়াই সে হাসে, কোনখানে এতটুকু ঢাকিয়া রাখে না। তা ছাড়া পণ্ডিত মশায়ের দুর্গতি ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সে-ও খুশি হইয়াছিল। ভদ্রলোক দিন কয়েক বাড়িতে আসিয়া তাহাকে অঙ্ক শিখাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কাঠাকালি বিঘাকালির সে শক্ত শাল কাঠ চিবাইতে গিয়া নীলিমার দাঁত নড়িত, চোখ দিয়া জল আসিত। উঃ, সে সব কী দুর্দিনই যে গিয়াছে।

রাসু সেন কহিলেন, হাসির কাই বটে। আর ছেলেগুলোও এমন জোট পাকিয়েছে বুঝলেন, যে আসামীর খবর কিছুতেই বের করে দিলে না। শেষকালে ক্লাশ শুদ্ধ সবগুলোর চার আনা করে ফাইন করলুম। কিন্তু এমন সব নচ্ছার ছেলে, ফাইন দিলে, তবু দোষীকে ধরে দিলে না।

প্রফুল্ল খুশি হইয়া বলিল : এ তো বেশ ভালো কথাই। ছেলেদের মধ্যে চমৎকার একটা একতা দানা বেঁধে উঠেছে। ভবিষ্যতে এদের দিয়ে—

বাধা দিয়া রাসমোহন কহিলেন, আরে রাখুন মশাই একতা! এ সব ছেলে কি সেই জাতের পেয়েছেন! এদের একতা শুধু বাঁদরামির বেলায়। দল বেঁধে কখন পরের বাগান লুট করবে, ফুটবল খেলবে, মারামারি করবে, এই হল এদের একমাত্তর উদ্দেশ্য। কই একটা ভালো কাজের কথা বলুন তো, তখন যদি এদের কাছ থেকে এতটুকু উপকার পান, তা হলে আমার নাকটা কেটে নেবেন।

প্রফুল্ল নত মস্তকে চায়ের বাটিটায় চুমুক দিতে লাগিল।

রাসমোহন বলিয়া চলিলেন : তবে আমাকে খুব ভয় করে, বুঝলেন! কোন রকম অসুবিধে ঘটলেই আমাকে খবর দেবেন, আমি সব শায়েস্তা করে আনব।

—আজ্ঞে।

রাসু সেন উঠিলেন, আচ্ছা তা হলে আমাকে ওদিক পানে যেতে হচ্ছে একবার। কাছারীতে লোকজন এসেছে কিনা। আজ আপনি বিশ্রাম করুন, কাল থেকে কাজে জয়েন করবেন।

—বিশ্রাম করবার কী আছে। আমি আজ থেকেই জয়েন করতে পারি।

—আরে না, না, এসেই অমনি—সে কী হয়? এক দিনে আর কী ক্ষতি হবে? তা ছাড়া আমি সেক্রেটারী, আমি আপনাকে বলছি—আপনি স্বচ্ছন্দে আজকের দিনটা বিশ্রাম করুন। কোনো ব্যাটা একটি কথা বলুক তো। আমি রাসু সেন, নিজে নড়ব, তবু আমার হুকুম নড়বে না।

প্রফুল্ল নিরুত্তরে মাথা নাড়িল।

রাসু সেন আবার বলিলেন: তা হলে আমি উঠি এখন। সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি ওদিককার, কষ্ট হবে না। আপনিও একটু জিরিয়ে নিন, রান্না হয়ে এলো বলে।

কিন্তু উঠি বলিলেই ওঠা তাঁহার স্বভাব নয়। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, নীলি, নীলি। নীলি খুব দূরে ছিল না, ডাকিতেই আসিয়া পড়িল।

—বাড়ীর ভেতর গিয়ে ঠাকুরকে তাড়া দে, রান্নাটা যেন চট করে সেরে ফেলে। মাস্টার মশাই কাল রাত্তির থেকে উপোস দিয়ে আছেন, তাঁর কষ্ট হচ্ছে—

প্রফুল্ল প্রতিবাদ করিয়া বলিল: আজ্ঞে না, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

রাসু সেন সে কথার কর্ণপাতই করিলেন না।

—আর মাখন সরকারকে বল, দীঘি থেকে বড় একটা মাছ ধরতে—দেরী হয় না যেন।

নীলিমা ঘাড় নড়িয়া চলিয়া গেল।

প্রফুল্ল সঙ্কুচিত হইয়া বলিল: কেন আপনি অনর্থক ব্যস্ত হচ্ছেন! ক্ষিধেও খুব বেশি—

—খুব বেশি না হোক, লেগেছে তো! আরে মশাই, যতক্ষণ পর্যন্ত উপায় আছে, ততক্ষণ যেচে শরীরকে কষ্ট দেন কেন? বলে শরীরমাদ্যং—হুঁঃ! আর দেখতেই পাচ্ছেন, ইস্কুলের সেক্রেটারী যখন হয়েছি, তখন কতবড় একটা কর্তব্যের বোঝা ঘাড়ে চেপে রয়েছে। এ কর্তব্যে যাতে এতটুকু ত্রুটি না হয়, সেটাও ত দেখতে হবে?

—তা বই কি।

রাসু সেন খুশি হইয়া কহিলেন : এই এক জ্বালা হয়েছে বুঝলেন। ধরে বেঁধে এরা তো সেক্রেটারী করে খাড়া করলে, কিন্তু এখন ঝুঁকি সামলাতে সামলাতে প্রাণ যায়।

বলিলেন বটে প্রাণ যায়, কিন্তু তাঁহার এই পদ-মর্যাদাকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার চোখে মুখে যে গর্বের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া প্রফুল্ল কৌতুক অনুভব করিল। রাসু সেন কোনও মুহূর্তেই নিজে সে কথা ভুলিতে পারেন না এবং পরিচিত কাহাকে ভুলিতে দেন না। তিনি সেক্রেটারী, সমস্ত ইস্কুলটাই তো তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া আছে। সেটা কি সহজ কথা হইল নাকি!

প্রফুল্লের সব রকম আরাম-বিরামের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মহামান্য সেক্রেটারী বাহির হইয়া গেলেন। কর্তব্যে যাহাতে একটু ত্রুটি না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখিতে হইবে তো।

তিনি চলিয়া গেলে প্রফুল্ল মৃদু হাসিল এবং তারপর একটা মোটা বই টানিয়া লইয়া বিছানায় গা এলাইয়া দিল। ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর তাহার ভাঙিয়া আসিতেছে।

হাতে একটা সাবান লইয়া এবং কাঁধে তোয়ালে ফেলিয়া শুক্লা তখন স্নানের জন্য পুকুরঘাটে চলিয়াছে। বিস্মিত হইয়া দেখিল, প্রফুল্লের দরজার ফাঁকে চোখ পাতিয়া চোরের মতো নীলিমা দাঁড়াইয়া আছে।

কী হা-ভাতে মেয়ে, মানুষজন কখনও কিছু দেখে নাই নাকি! যা দেখিবে, তাহারই দিকে এমন হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিবে যে গায়ে জ্বালা ধরিয়া যায়। রূঢ় ভাবে শুক্লা কী একটা বলিতেও গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাহার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল নীলিমার। এবং চোখা-চোখি হইবা মাত্রই আর কথা নাই, নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া নীলিমা অদৃশ্য হইয়া গেল। এত বড় ধিঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে মেয়েটা, তবু এ পর্যন্ত

ভদ্রভাবে চলিতে অবধি শিখিল না। অস্ফুট একটা বিরক্ত মন্তব্য করিয়া শুক্লা ঘাটের পথে আগাইয়া গেল।

* * * *

দুপুরটা কাটিতে না কাটিতে এক সঙ্গে অনেকে আসিয়া প্রফুল্লের ঘরে ভিড় জমাইলেন। আসিল মুকুল, আসিল রবি। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আসিলেন নরেশ কর, রাস্থ সেন স্বয়ং আর আসিলেন অনাথ কবিরাজ।

আলোচনার ব্যাপারটা কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর হইয়া উঠিল এবং যথা নিয়মে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নরেশ করের উদ্দীপ্ত গলা অন্য সকলের কণ্ঠস্বরকে ছাড়াইয়া গেল।

—দেখুন, ইস্কুলটাকে ন্যাশনাল করে তুলুন, খাঁটি জাতীয় ইস্কুল। পাশ করে ইংরেজের চাকরী পাওয়াটাই যে সব ছাত্রের জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য, তাদের দিয়ে দেশের কী হবে, বলুন? জানেন তো কবি লিখেছেন :

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙালী করে—"

রাস্থ সেন থামাইয়া দিয়া কহিলেন : আরে রাখো ভায়া, বক্তৃতে আর দিয়োনা। ন্যাশনাল ইস্কুল করতে গেলে অবস্থা কী দাঁড়াবে, সেটা একবারও ভেবে দেখেছ? মাসে দুশো টাকা করে এইড পাচ্ছ, অমনি ইন্‌সপেক্টর অফিস থেকে সেটা ঘ্যাচাং করে কেটে দেবে। তার পরেই ব্যাস্—তিন মাসের মধ্যেই চোখ উলটে যাবে ইস্কুলের।

অনাথ কবিরাজের দাড়িওয়ালা মাথাটা নাড়িতে লাগিল। বুজিয়া যাওয়া চোখ দুইটা একটু খুলিয়া সে কহিল : ঠিক কথা।

প্রফুল্ল এতক্ষণে ভালো করিয়া অনাথ কবিরাজের দিকে চাহিয়া দেখিল। লোকটির বয়স ষাটের নীচে নয়। মাথার বড় বড় চুলগুলি বেশির ভাগই সাদা হইয়া গিয়াছে। দাড়ি নামিয়াছে বুক পর্যন্ত। চোখের চামড়া কুঞ্চিত, সমস্ত মুখের উপর বুভুক্ষা-পীড়িত শীর্ণ একটা পাণ্ডুর ছায়া। আর্থিক অবস্থা যে তাহার আদৌ ভালো নয়, তাহার দিকে চাহিতেই সেটা বিলক্ষণ বোঝা গেল। গায়ে সাদা জিনের একটা কোট, কাঁধের উপর দিয়া সেলাই খুলিয়া গিয়াছে, গলার কলার এবং হাতা হইতে সূতা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মাঝখানে দুই তিনটা বোতাম নাই। পরণের কাপড়খানা ময়লা, ছিন্ন তালিমারা কেডস্ জোড়াকে খুলিয়া রাখিয়া সে এত সঙ্কুচিত দীনভাবে বিছানার এক পাশ ঘেঁসিয়া জড়সড় ভাবে বসিয়া আছে যে, তাহাকে দেখিলে অত্যন্ত সহজেই করুণার উদ্রেক হয়।

নরেশ কর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন: কি মশাই, এইড কেটে দেবে! কেটে দেওয়া চারটিখানি কথা আর কি! এই যে গবর্ণমেণ্ট চুষে নিংড়ে আমাদের কাছ থেকে এতগুলো টাকা নিয়ে যাচ্ছে, তা থেকে আমাদের কি কিছুই দেবে না!

রাসু সেন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, সে বিচার তুমি তাদের সঙ্গেই কোরো ভায়া। কিন্তু ইস্কুলের সেক্রেটারী হয়ে আমি ওসব ব্যাপারের প্রশ্রয় দিতে পারব না।

তারপরেই তর্ক মাত্রা ছড়াইয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। বক্তা দুই জনেই সমান, কেহ কথায় কাহারো কাছে হার মানিবেন, এমন তাঁহাদের স্বভাবই নয়। প্রফুল্ল নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, অনাবশ্যক এবং অহেতুক তর্কে ইহারা কেমন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতে পারেন। যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি ইহাদের যে

পর্যায়েরই হোক, এ সময়ে সে উদ্দাম উত্তেজনা দেখিলে কে বলিবে যে রাজনীতি, ধর্মনীতির ব্যাপারে মাথা গলাইলে ইঁহারা অনায়াসেই প্রচণ্ড এক একজন নেতা হইয়া উঠিতে পারিতেন না!

রবি বিস্ফারিত চোখ মেলিয়া ইঁহাদের কথাগুলি গিলিতেছিল, মধ্যে মধ্যে টুক্‌রো টুক্‌রো মন্তব্যও পেশ করিতেছিল এখানে ওখানে। কিন্তু মুকুল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, এ বক্তৃতা না থামাইলে তো চলে না।

কহিল, কাকা, নতুন হেডমাস্টার যে এসেছেন, এ কথা প্রেসিডেন্টকে জানানো হয়েছে তো?

রাসু সেন চকিত হইয়া কহিলেন: হাঁ, তাঁকে তো সকালেই খবর দিয়েছি।

—আপনি নিজে গিয়েছিলেন?

—না, রাজেনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি।

—বলেন কি! এ তো আমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল। জানেনই তো, এসব সেক্রেটারীর কর্তব্য। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট নিজেই ইস্কুল দেখতে আসবেন, কিংবা হেড মাস্টার গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন—

—ঠিক, ঠিক বলেছ তো। রাসু সেনের তর্কস্পৃহা মুহূর্তে স্তিমিত হইয়া গেল। সেক্রেটারীর কর্তব্য কথাটা তাঁহার রক্ত-মাংসে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়াইয়া আছে, সংস্কারের গোড়ায় ঘা লাগিলে বিশ্ব-সংসার মুহূর্তে তাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়া যায়।

রাসু সেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চটি জোড়াকে টানিয়া লইয়া কহিলেন: তাই তো, এখনি একবারটী যেতে হচ্ছে। ভুল হয়ে যায় ভায়া, বয়েস হয়েছে কি না! তোমাদের মতো যখন ছিলুম, তখন কোন কাজে একটু কি ত্রুটি হওয়ার জো ছিল! পানের থেকে চুণটি অবধি

খসতে পেতনা। আচ্ছা, তোমরা বসে আলাপ আলোচনা কর, আমি ঘুরে আসি একটু।

আপত্তি করিলেন নরেশ কর।

—যাবেন মানে? এ কথাটার একটা মীমাংসা না হওয়া ইস্তক তো আপনাকে ছাড়তে পারি না। পলিটিক্সের এতবড় একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথাই যদি তুললেন, তা হলে শেষ পর্যন্ত তার একটা রফা হওয়া চাই তো। এসব ব্যাপার সোজা নয় সেন মশাই,—সমস্ত ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম এর ওপরেই নির্ভর করছে।

রাসমোহন ভ্রূ-ভঙ্গি করিয়া কহিলেন, তুমি বড্ড বাজে বকতে পারো নরেশ। দেখছ ইস্কুলের ব্যাপার, আমি সেক্রেটারি—এখন কাজের সময় ওসব মীমাংসা-টীমাংসা চলবেনা। তোমাদের ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস চুলোয় যাক, আমি—

—ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস চুলোয় যাক মানে? গর্জন বলিলে যাহা বুঝায়, নরেশ কর তাহাই করিলেন। প্রফুল্লের মুখের দিকে জলন্ত দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন, শুনলেন মশাই, কথাটা একবার শুনলেন? ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস চুলোয় যাবে! এতবড় কথাটা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট অবধি বলতে পারেন না, তা—

কিন্তু তিনি কথাটা শেষ করিবার আগেই রাসু সেন বাহির হইয়া গেলেন।

নরেশ কর উঠিয়া পড়িলেন, বাঃ, সেন মশাই সত্তি-সত্যিই চললেন যে!

বাহির হইতে উত্তর আসিল, সত্যি সত্যিই চললাম।

—দাঁড়ান, দাঁড়ান, কথাটার একটা মীমাংসা হয়ে যাক—নরেশ কর উত্তেজিত হইয়া প্রায় ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেলেন।

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল, বাঁচালেন মুকুলবাবু। নইলে এ তর্ক যে আরও কতক্ষণ চলত, ঠিক নেই।

মুকুল প্রসন্ন মুখে কহিল: এর মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বুঝি? কিন্তু সেক্রেটারীর কর্তব্য কথাটা শিখে রাখুন, ওটা ব্রহ্মাস্ত্র। জায়গামত ব্যবহার করতে পারলে ব্যর্থ হবে না, এ আশ্বাস আপনাকে দিলাম।

প্রফুল্ল কহিল: তাই তো দেখছি।

তারপর আলোচনা সুরু হইল। ইস্কুলের উন্নতি ও কল্যাণের গণ্ডী-রেখা ছাড়াইয়া সে আলোচনা সমস্ত দেশময় প্রসারিত হইয়া পড়িল। মানুষের বিরাট সভা-প্রাঙ্গণে মানুষের মতো করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার যে কল্পনায় ইহাদের যৌবনোন্মুখ চিত্ত অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে, তাহারি আলোচনায় ইহারা বিভোর হইয়া গেল।

আর নীলিমা—যেহেতু মুকুল দা, রবি দা এবং আরও অনেকে ঘরের মধ্যে ভিড় জমাইয়া আছে এবং এ সময়ে সঙ্গত-অসঙ্গত কোনো সুযোগ লইয়াই ওখানে যাওয়া চলে না, সুতরাং সে দরজার বাহিরে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাড়ীর কেউ এ ভাবে তাহাকে দেখিলে কিছুই মনে করিবে না, কারণ এটা যে তাহার স্বভাবের একটা বিশেষ লক্ষণ, সে কথা সবাই জানে। তা ছাড়া কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে, বাবার খোঁজে আসিয়াছিল। ভয় তো একমাত্র সেজদিকেই। তা সে এখন চিঠি লিখিতে বসিয়াছে, দু তিন ঘণ্টার আগে নীচে নামিবার সম্ভাবনা নাই। বাবাঃ, কী অসম্ভব চিঠি লিখিতেই পারে সেজদি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সে যে এত কী লেখে, নীলিমা সেটা ভাবিয়াই পায় না। মেয়ে মানুষের অত চিঠি লিখিবার ক-ই বা দরকার! ও রকম করিলে লোকে নিন্দা করে। এক তো স্বামীর কাছে চিঠি

লেখার ব্যাপারটাই আসল, তা সেজদির তো বিয়েই হয় নাই। পাতার পর পাতা ভরিয়া এত লম্বা চিঠি তবে সে কার কাছে লেখে! যাই বলো বাপু, কলিকাতার মেয়েদের ধরণ-ধারণই যেন কেমন কেমন। ওই জন্যই তো শুক্লার সঙ্গে তার বনিতে চায় না।

শুক্লা যাহাই থাক, নীলিমার তাহাতে কিছু আসে-যায় না; কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রফুল্ল কথা বলিতেছে, প্রফুল্ল হাসিতেছে। নীলিমার কী অসম্ভব যে ভালো লাগিতেছে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। হাসি অনেকেরই শোনা যায় হয়তো, কিন্তু এমন নিঃসঙ্কোচ উন্মুক্ত হাসি সে আর কখনও শোনে নাই। এ হাসির মধ্য দিয়া সমস্ত অন্তর যেন বিনা দ্বিধায় সকলের চোখের সামনে একখানা পুঁথির মতো খুলিয়া যায়।

কথা বলে আস্তে আস্তে, রবিদার মতো ক্ষেপিয়া ওঠে না। চেঁচানোও তাহার স্বভাব নয়। কিন্তু যেভাবেই বলুক, তাহার বলার ভঙ্গিতে এটাই বেশ বোঝা যায় যে, সে ইহাদের কাহারো চাইতে ছোট তো নয়ই, বরং অনেক উপরে। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস আছে এবং সে বিশ্বাসের পরিচয় তাহার প্রত্যেকটি কথার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে।

—বিচলিত হয়ে লাভ কী! যা করবার, তা ধীরে-সুস্থেই করতে হবে। আপনারা তো আছেনই, আর রইলাম আমি—দেখি কতদূর এগোনো যায়।

কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল, এখানে আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না। মা'র তো কিছুর একটা ঠিক-ঠিকানা নাই—শেষ পর্যন্ত হয়তো বা গালাগালিই আরম্ভ করিয়া দিবেন। নীলিমা সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া চলিল।

ছেলেদের দলটি যখন বিদায় লইল, তখন সন্ধ্যা বেশ ঘন হইয়াই

নামিয়াছে। এতক্ষণে প্রফুল্ল বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, সেই তখন হইতেই অনাথ কবিরাজ এখনও এক পাশে ঠায় বসিয়া আছেন। শুধু বসিয়াই থাকা নয়, এমন নীরবে, নিশ্চিন্ত শান্তিতে তিনি বসিয়া আছেন যে, এতক্ষণ তাঁহার অস্তিত্ব তাহারা ভুলিয়াই গিয়াছিল।

ডাকিল, কবিরাজ মশাই।

কবিরাজ মশাই সাড়া দিলেন না।

আর একবার ডাকিতেই কবিরাজ যেন চটকা ভাঙিয়া নড়িয়া-চড়িয়া উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, হাঁ, কী বলছিলে রাসু দা? আর সে তো নিশ্চয়ই, তুমি যা বলবে তার ওপর—

প্রফুল্ল হাসিয়া ফেলিল, ওঃ, আপনি এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলেন বুঝি। কিন্তু রাসুদা দু'ঘণ্টা আগে উঠে গেছেন, আমি প্রফুল্ল।

অনাথ কবিরাজ চোখ রগড়াইয়া বলিলেন, তাই তো, বটেই তো। তারপর অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া কহিলেন, বুড়ো বয়সে একটু আফিং ধরেছি কি না, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

প্রফুল্ল হাসিল।

—কতটা করে খান আফিং?

—বেশি আর কী খাব, আগে মুসুরি পরিমাণ ছিল, এখন মটর পরিমাণ হয়েছে। তা-ও খরচ চালাতে পারি না। নেশা পোষা কি আমাদের মতো গরীবের কাজ। বুঝতেই পারেন, সেই সঙ্গে পরিমাণ মতো দুধ না হলে—

প্রফুল্ল মাথা নাড়িয়া বলিল, তা তো বটেই।

হঠাৎ অনাথ কবিরাজ প্রফুল্লের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া আসিলেন। একটু আগেই চাকর ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছে; প্রফুল্লের

মনে হইল, সেই আলোকে অনাথ কবিরাজের মুখখানা অদ্ভুত রকমের বুভুক্ষু দেখাইতেছে। জরা মানুষকে কী অশোভন রকমেই না বিকৃত করিয়া দেয়! সমস্ত মুখের উপর তাঁহার আঁকা-বাঁকা রেখা—যেন জীবনের বিষাক্ত সরীসৃপটার গতি-চিহ্নে তাঁহার পরাভূত মন অঙ্কিত হইয়া আছে। মুখ ভরিয়া তাঁহার বিশৃঙ্খল দাড়ি, বড় বড় পাকা চুল কাঁধ পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ময়লা জামা হইতে কদর্য একটা ঘামের গন্ধ। প্রফুল্ল সরিয়া বসিল।

অনাথ কবিরাজ কহিলেন, মকরধ্বজ কিনবেন, মকরধ্বজ? ষড়গুণাবলিজারিত খাঁটি মকরধ্বজ! ইচ্ছে হলেই আমার কাছ থেকে নিতে পারেন, খুব সস্তায় দেব। গাঁয়ে রসিক কবিরাজ আছে, বুঝলেন সে ব্যাটা কিছুই জানে না, তবু সব্বাই তাকে ডাকে, তার কাছ থেকে ওষুধ কেনে। কিন্তু সে যে মকরধ্বজের নাম করে একেবারে আসল রস-সিন্দুর চালিয়ে দিচ্ছে, সে খবর কেউ রাখে? আপনি নতুন লোক, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি,—ওর কাছ থেকে ওষুধ কিনবেন না, কখনো না।

প্রফুল্ল হাসি চাপিয়া বলিল, আজ্ঞে না।

—তা হলে এখন এক তোলা মকরধ্বজ দিই আপনাকে, দেব? কথার সঙ্গে সঙ্গেই জিনের ছেঁড়া শাদা কোটটার পকেটে হাত দিয়া অনাথ কবিরাজ কাগজের একটা মোড়ক বাহির করিলেন: খেয়ে যদি উপকার না পান, তা হলে আমার নামই নেই। আজ চল্লিশ বছর ধরে কবিরাজী করছি, হুঁ, তবু ওই রসিক কবিরাজ বলে যে, আমার ওষুধ সব—

বাধা দিয়া প্রফুল্ল বলিল, আজ্ঞে না, নিশ্চয়ই খাঁটি। কিন্তু সত্যিই আপনি মকরধ্বজ বের করলেন নাকি? আমার এখন মকরধ্বজের কোনো দরকার নেই তো।

—দরকার নেই? অনাথ কবিরাজ ম্লান হইয়া আসিলেন, এখন দরকার না থাকলেই বা কি, যখন-তখন তো দরকার হতে পারে। এই মনে করুন, চট্ করে এক সময় মাথা ধরে গেল—

—আমার কখনো মাথা ধরে না, ও রোগ আমার নেই।

অনাথ কবিরাজ বোকার মতো খানিকটা হাসিলেন: হতে কতক্ষণ। রোগের কথা কে অত জোর করে বলতে পারে? নিয়েই রাখুন না, অসময়ে অবেলায় কাজ দেবে।

—আজ্ঞে না, দরকার হলে আপনার কাছ থেকে অসময়ে অবেলায়ই নিতে পারব। এখন নয়।

—আচ্ছা। অনাথ কবিরাজ মোড়কটাকে আবার কোটের পকেটেই গুঁজিয়া রাখিলেন। তাহারই মধ্যে প্রফুল্ল লক্ষ্য করিতে পারিল: নীল শিরা বাহির-করা গাঁট-সর্বস্ব আঙুলগুলি তাঁহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, তাঁহার মুখ কিসের একটা ছায়ায় অদ্ভুত রকম ম্লান হইয়া গেছে। দারিদ্র্য—দারিদ্র্যের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু: এমন অস্বাভাবিক, এমন বীভৎস করুণ মুখ প্রফুল্ল আর কখনো দেখে নাই; এই কারুণ্যের দিকে চাহিলে মন সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া আসে না; ঘৃণায় যেন শিহরিয়া উঠিতে চায়। রূপহীন শ্রীহীন এই দারিদ্র্য—অতি দরিদ্র এই দারিদ্র্য! মৃত্যুর যেমন বহু বিচিত্র রূপ আছে—মধুর এবং বিস্বাদ, বিশাল এবং সঙ্কীর্ণ, পরিচ্ছন্ন এবং পঙ্কিল, —জীবনের সমস্ত পর্যায়গুলিকেও তেমনি করিয়া একের পর এক ভাগ করিয়া লওয়া চলে। শিল্প যাহাদের মনে, সৌন্দর্য যাহাদের কল্পনায়—এই কুশ্রী কুৎসিৎ দীনতাকেও তাহারা সুন্দর করিয়া লইতে পারে। এই দারিদ্র্যই বৃহত্তর এবং মহত্তর হইয়া উঠিতে পারে তাহাদের জীবনে।

অনাথ কবিরাজের জরা-চিহ্নিত বুভুক্ষাজীর্ণ বীভৎস মুখের দিকে

তাকাইয়া প্রফুল্ল আহত বোধ করিতে লাগিল ; মনে হইতে লাগিল—পশুর মতন মূঢ় ওই চোখের দৃষ্টি তাহাকে যেন পীড়ন করিতেছে, ওই রুক্ষ মুখখানা যেন প্রহার করিতেছে তাহাকে।

অনাথ কবিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অস্থি-প্রকট হাত দুখানি তুলিয়া নমস্কার করিলেন, কহিলেন আচ্ছা তা হলে আমি চললুম আজকে। অনেক বিরক্ত করলুম, কিছু মনে করবেন না।

ঠুক্ ঠুক্ করিয়া অনাথ কবিরাজ বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, প্রফুল্ল তাঁহাকে ডাকিল।

—শুনুন, শুনুন কবিরাজ মশাই, মকরধ্বজটা ভালো হবে তো আপনার?

অনাথ কবিরাজ ফিরিলেন। প্রত্যাশায় তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—নেবেন নাকি? বেশ বেশ। কত দেব? এক তোলা?

প্রফুল্ল কহিল, তাই দিন।

অনাথ করিরাজ পকেট হাতড়াইয়া ফের মোড়কটা বাহির করিলেন: মেপে দেব?

—থাক্ দরকার নেই। কত দাম?

—সকলের কাছে বারো আনা করেই বেচি। তবে আপনি নতুন লোক, আপনাকে আট আনা—

বাধা দিয়া প্রফুল্ল বলিল: না না নতুন লোক বলে কম নেবেন কেন? আমি বারো আনাই দিচ্ছি।

একটা টাকা সে বাহির করিয়া দিল।

টাকাটা তুলিয়া দ্বিধাগ্রস্ত মুখে অনাথ কবিরাজ কহিলেন, কিন্তু এর ভাঙানি তো এখন—

—যখন হয় দেবেন। ও জন্যে তাড়া নেই।

—আচ্ছা—অনাথ কবিরাজ হাসিলেন। পরিতৃপ্ত, আনন্দিত হাসি। এক টুকরা হাড় পাইলে রাস্তার কুকুরের মুখে যদি কোনো রকমের হাসি ফুটিয়া উঠিত, তাহা হইলে দেখা যাইত, এ হাসি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

—কাল সকালেই আপনাকে পয়সা চার গণ্ডা দিয়ে যাব—ঠিক। তা হলে যাই এখন, রাত অনেক হয়েছে, কী বলেন ?

প্রফুল্ল বলিল : আসুন।

বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া অনাথ কবিরাজ হাতের লাঠিটা ঠুক্ ঠুক্ করিয়া চলিতে লাগিলেন। বুড়ো মানুষ, বয়স অনেক হইয়াছে, অন্ধকারের মধ্যে চলাফেরা করিতে গিয়া যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। প্রফুল্লের একবার মনে হইলে, বাহিরে গিয়া সে লণ্ঠনটা ধরিয়া অনেকখানি পথ আগাইয়া দেয় তাঁহাকে। পরক্ষণেই সে ভাবিল : এই জীবন, এই প্রাত্যহিকের সংঘাতই যাহাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে, এত সুখ তাহাদের সহিবে না।

কাল সকালেই কি অনাথ কবিরাজ টাকার চেঞ্জ দিতে আসিবেন ? আসিতেও পারেন। প্রফুল্লের কেমন যেন হাসি পাইতেছিল। সত্যি সত্যিই সে শেষ পর্যন্ত সিনিক হইয়া উঠিল নাকি !

রাত্রি বাড়িতে লাগিল, গ্রামের উপর মৃত্যু পাণ্ডুর নীরব নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল। শিববাড়ীতে কান্ত নাগের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হইয়া গেল, বাজারের পথে শেষ লোকটিও চলাচল শেষ করিল। ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে নিশীথের অঞ্চলছায়ায় গ্রামের আর একটা বিচিত্র রূপ, আর একটা প্রচ্ছন্ন জীবন বিকসিত হইয়া উঠিল।

সরকারদের দীঘির পার হইতে চৌকিদারের হাঁক শোনা গেল, রায়দের বাগান আর গাঙ্গুলিদের ভিটায় খালের ধারে ধারে হোগ্‌লা বনের আড়ালে আড়ালে শেয়ালের ডাক শোনা যাইতে লাগিল।

কেন যে আজ ঘুম আসিতে চায় না—শুক্লা উঠিয়া বসিল। খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের রাত্রিটা উঁকি মারিতেছে—যেন অন্ধকারের একটা উচ্ছল তরঙ্গ বাহির হইতে বন্যার জলের মতো বহিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে আছড়াইয়া পড়িল। একটুকরো চাঁদ কাস্তের মতো বাঁকা হইয়া সুপারী বনের প্রান্তরেখায় অস্তে নামিয়া চলিল।

জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল শুক্লা। অন্ধকারের রঙ ঠিক কালো নয়,—কুয়াসার খানিকটা শাদাটে রঙ সেই অন্ধকারের সাথে মিশিয়া সেটাকে অনেকখানি যেন হালকা করিয়া দিয়াছে। যেন খানিকটা ধোঁয়া এই তমসাবৃত পথঘাট, অরণ্যের উপর দিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু শুক্লা ভাবিতেছিল তপনের কথা। এই বিচিত্র সৃষ্টি-ছাড়া লোকটিকে তাহার ভালো লাগে। ব্যবহারিক জীবনের কোন প্রয়োজনেই যাহাকে পাশে খুঁজিয়া পাওয়া যায়না, মনের জগতে যে নিজের কাছেই নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে—সেই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় আত্ম-অচেতন লোকটি তাহার অন্তরে যে এতবড একটা সাড়া তুলিয়াছে, তাহার স্বরূপ শুক্লা যেন এই মুহূর্তেই অনুভব করিল।

আশ্চর্য—এই মুহূর্তেই সে অনুভব করিল! নাগরিক জীবনে সে অনেক পাইয়াছে, অনেক স্তুতি ও স্তাবক তাহার রূপ ও ঐশ্বর্যের চারি পাশে আসিয়া মৌমাছির মতো ভিড় করিয়াছে। কিন্তু শুক্লার মানসিক আভিজাত্য কোনোদিন তাহাকে তাহাদের দিকে তাকাইতে অবধি দেয় নাই। তাহার মন যে কোথাও কোন দিন বাঁধা পড়িবে না, একথা সে

জানিত, নিশ্চয় করিয়াই জানিত ; সে কাহারও কাছে আগাইয়া যাইবে না, যাহার আসিবার প্রয়োজন, আপনিই আসিবে—এমনি একটা ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল শুক্লার ; কিন্তু তপন তাহাকে জয় করিল। তাহাই নয়—তপনের এই বিচিত্র নিরাসক্ত মনকে জাগাইয়া তুলিবার কাজও আজ হইতে তাহারই—আগাইয়া যাইতে হইবে তাহাকেই, তপনের মনকে অনুপ্রেরিত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব তাহারই।

আর তা ছাড়া তপন, যে লোকটির মধ্যে স্তূপীকৃত অসঙ্গতিই এতদিন তাহার চোখে পড়িয়া আসিয়াছে, সংস্কৃতির সুশৃঙ্খল পারিপাট্যকে যে অস্বীকার করিতেই অভ্যস্ত, তাহার নিজের অতি পরিচ্ছন্ন সংস্কৃতি-লোভী মন সেই অসঙ্গতিগুলিকেই কি না অত্যন্ত সহজ অবলীলায় শুধু গ্রহণ নয়, ভালবাসিয়া ফেলিল ! নিজেকে শুক্লা যেন এখনও বিশ্বাস করিতে পারে না।······

শুক্লা সেতারটি নামাইয়া আনিল। মনকে এভাবে আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

ওদিকে পাশের ঘরে নীলিমাও ঠিক তাহারই মতো করিয়া আর একজনের কথা ভাবিতেছিল।

প্রফুল্ল—প্রফুল্ল ! কী করিতেছে সে এখন ? হয়তো বাতি জ্বালাইয়া লেখাপড়া করিতেছে নতুবা রাত্রি জাগিয়া দেশের কথা, বাড়ীর কথা ভাবিতেছে। আচ্ছা প্রফুল্লের কি বিয়ে হইয়াছে ? কথাটা ভাবিতে গিয়াও নীলিমার বুকে যেন ধ্বক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল। না, এমনটা হইতেই পারে না। আচ্ছা, কালই কৌশল করিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে বাবাকে।

কিন্তু আজ এ কী হইল নীলিমার। ঋতু-চক্রের আবর্তন গতি অনুসরণ করিয়া ষোলটি বসন্ত আসিয়াছে পৃথিবীতে, আসিয়াছে অরণ্যে।

নদীর নীলাভ নির্মল জলে যেন কাহার চোখের স্বপ্নাঞ্জন ছড়াইয়া গিয়াছে, মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে বাসন্তী বনশ্রী, ভাঁটফুলের কেশর পল্লীর পথে পথে ঝরিয়া পড়িয়াছে, আমের মুকুল মধু-সৌরভে বাতাসকে মদির করিয়া দিয়াছে। জ্যোৎস্না-তরঙ্গিত সমস্ত রাত্রি ভরিয়া কোকিল ডাকিয়াছে, ছাদের আলিশায় এক জোড়া কপোত-কপোতী বিহ্বল কূজন করিয়াছে। এই যে ষোলটি বসন্ত আসিয়াছে গিয়াছে, আজ কতদিন পরে নীলিমা অনুভব করিল, আসিয়াই তাহারা চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বৃথা যায় নাই। তাহারা তাহাদের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে, গন্ধ রাখিয়া গিয়াছে; এবং সেই স্মরণের গন্ধে নীলিমার তরুণ বুকের রক্ত উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে।

ভয়ে, সন্দেহে, আনন্দে এবং উত্তেজনায় নীলিমার সমস্ত বুকটা দপ দপ করিতে লাগিল, কপালের একটা রগ যেন লাফাইতেছে।—প্রফুল্ল, প্রফুল্ল! একটা বিচিত্র মদের নেশা যেন নীলিমাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে। প্রেম, ভালোবাসার কথা সেকি শোনে নাই? নিশ্চয় শুনিয়াছে। সে কি তবে প্রফুল্লকে ভালোবাসিল?

নীলিমার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—একথা ভাবিতে গেলেও উত্তেজনায় মাথার স্নায়ুগুলি অবধি ছিঁড়িয়া যাইতে চায়। নীলিমার মনে হইল, তাহার কান্না পাইতেছে। অর্থহীন কারণহীন একটা কান্নার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস তাহার বুকের মধ্য হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া কণ্ঠের কাছ অবধি আছড়াইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এত রাত্রে কোথা হইতে মিষ্টি বাজনার সুর আসিতেছে? সেজদি সেতার বাজাইতেছে নিশ্চয়; সত্যি, সেজদির যত দোষই থাক, চমৎকার সেতার বাজাইতে পারে সে। শুনিলে ঘুম পায়, যেন চোখ বুজিয়া আসে। কিন্তু আজ নীলিমার কী যে হইল! নিস্তব্ধ মধ্য রাত্রিতে নির্জন বড় বাড়ীটাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া যে প্রশান্তির মায়া

তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে, তাহারই অন্তস্তলে ওই সেতারের সুরটি এমন করুণ হইয়াই বাজিতেছে যে, ওই সুরে নীলিমার সমস্ত অন্তরটাই কেমন করিয়া উঠিল। সেতারের প্রতিটি মূর্ছনাই তাহার বুকের মধ্যে একটা পরম স্পর্শাতুর দুর্বল কেন্দ্রকে আঘাত করিতেছে, আর সেই আঘাতে কখন যেন নীলিমার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু নামিয়া আসিয়াছে।···

প্রফুল্ল ঘুমাইতেছিল। সমস্ত দিন ভালো করিয়া বিশ্রাম নিতে পারে নাই, আগের রাত্রি অসম্ভব পথশ্রমের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে, কী একটা চিঠি লিখিতে লিখিতে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খোলা মশারিটা বাতাসে হু হু করিয়া উঠিতেছে; চিঠির কাগজ কোথায় যে উড়িয়া গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। লণ্ঠনের আলোটা তাহার ক্লান্ত মুখের উপর প্রতিফলিত হইতেছিল।···

আর জাগিতেছিল কবি তপন।

এই নির্জন রাত্রি, বাহিরে নক্ষত্রকিরণে অনুজ্জ্বল গ্রাম-পথ, কুয়াসা-মিশ্রিত অন্ধকার; সুপারির পাতা হইতে টুপ টুপ করিয়া শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে, দাঁড় আর লাগির ঘায়ে খালের ঘুমন্ত জলকে জাগাইয়া বুনো ঘাস আর নলখাগড়ার বনে তন্দ্রাতুর গঙ্গা ফড়িং আর ছোট ছোট প্রজাপতিগুলিকে সচেতন করিয়া বিদেশী নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে, জলের কলরোল ডিঙাইয়া ঝপাং ঝপাং করিয়া একটা শব্দের ঐকতান সঙ্গীতের মতো তপনের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল।

তপন লিখিবে, লিখিবার প্রেরণা পাইতেছে। কী লিখিবে সে জানেনা, কোনো নতুন ছন্দও মুক্তি পাইবার প্রলোভনে তাহার মনের মধ্যে গুন গুন করিতেছে না, তবু সে লিখিবে।

কাগজ টানিয়া সে লিখিয়া চলিল।

ঘস্ ঘস্ করিয়া কলম চলিতেছে, বাতাসে চুল উড়িতেছে তপনের, কিন্তু এতক্ষণ সময় নষ্ট করিয়া সে এ কী লিখিল। তাহার অবচেতন মনে এ কবিতা যে কোথায় প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল, তপন তাহার কোনও সন্ধানই তো পায় নাই :

হেমন্ত রাতে স্বপ্ন বুলায়ে নামিল তিমির মায়া
আমারো মনের অতল অন্ধকারে,
মৃত স্মরণের সমাধি ফুঁড়িয়া বাহিরিল প্রেত ছায়া
কঙ্কাল দল হেসে ওঠে বারে বারে।
সহসা বাজিল মর্মর ধ্বনি রিক্ত উদাস বনে
শুক্লা শশীর আভাস লাগিল দিগন্তে সুনগনে,
রজনীগন্ধা কোথায় জাগিল নিভৃত কুঞ্জতলে,
দীপ্ত প্রখর আলোকের তরবারে,
আঁধার চিরিয়া হে রূপলক্ষ্মী সমুখে দাঁড়ালে আসি
ধন্য করিলে প্রেমের কিরণ ধারে।
শুক্লা. তোমার শুক্ল রূপের স্পর্শ-পুলক লভি'
আমাতে ফুটিল পূর্ণিমা শতদল,
সিন্ধুমথিতা ইন্দিরা সম এলে চিরবল্লভী,
করুণা কিরণে দুটি আঁখি ছল ছল—

* —শুক্লা। বিচিত্র নাম! গানের মতো সুন্দর, ছন্দের মতো লীলায়িত। এই নামটির সঙ্গে সঙ্গেই ছন্দ জড়াইয়া আছে, এই নামটিই যেন মূর্তিমান কবিতা!

অর্ধ সমাপ্ত রচনাটির উপর দিয়া সে কেবল এলোমেলোভাবে লিখিয়াই চলিল : শুক্লা, শুক্লা, শুক্লা, শুক্লা !

মুকুল ঘুমায় নাই, এমন অনেক রাত্রি সে ঘুমায় না। রাত জাগিয়া সে বাড়ীর বারান্দায় পায়চারী করে, নিজের মনে মনেই স্বপ্ন দেখে, ভাবিতে ভালোবাসে। সাধারণের সঙ্গে সঙ্গে, সহজ মানুষদের পাশে পাশে পা মিলাইয়া চলিতে চলিতে অসাধারণ কবে তাহাকে ডাক পাঠাইয়াছে। জীবনের সুনিয়ন্ত্রিত গতিপথে গতানুগতিক একটা চিরন্তন পরিণতির যে স্বপ্ন সে দেখেতেছিল, কেমন করিয়া কিসের আকস্মিক সংঘাতে সে স্বপ্ন, সে কল্পনা তাহার কাচের মতো ঝন্ ঝন্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল, রক্তে রক্তে আগুন ধরিয়া গেল মুকুলের !

অন্ধকার আর অসীম আকাশ—ইহারই মধ্য দিয়া মুকুলের সমস্ত দৃষ্টি যেন সমস্ত দেশ, মহাদেশ, জাতি, মহাজাতির অন্তরের চিরন্তন সত্যটিতে গিয়া পৌছিয়াছে। শুধু দারিদ্র্য—শুধু হীনতা, শুধু ক্ষুদ্রতা ! তিল তিল করিয়া জীবন ক্ষয় হইতেছে, চলিতে চলিতে প্রতি পায়ে শৃঙ্খল ঠন্-ঠন্ করিয়া গণ-দেবতাকে বিদ্রূপ করিতেছে, শাসনের নির্মম শোষণে বিশ্ব-মানবের রক্ত দিনের পর দিন কণায় কণায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে।

মানুষ গড়ে, মানুষ রক্ষা করে, প্রতিদিনের যাত্রা পথটিকে নিত্য-নব প্রগতির চক্র-রেখায় চিহ্নিত করিয়া যায়। আবার সেই মানুষ ভাঙিতে চায়, বিপ্লব আনে, স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা এবং বিশ্বগ্রাসী লোভের বর্বর-বিকারে মানবতার অগ্রগামিতার পথ শত শতাব্দী ধরিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখে।

এ অসঙ্গতি কেন থাকিবে, এই অত্যাচারের সিংহাসন যুগ-যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কেন থাকিবে অটুট এবং অনড় ? যে

মানুষ নিজের মধ্যে সুন্দরের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করিয়াছে, প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে শিল্প-কলা-সৌন্দর্যের পরমতম সার্থক সত্তাকে, সে কেন আবার কুশ্রীতার জয়গান গাহিবে! মুখের উপরে প্রতারণার মুখোস টানিয়া তাহার নিজের গড়া নীতিকেই কেন ভাঙিয়া চুরিয়া খানখান করিয়া দিবে?

মানুষ মানুষের অপমান করে, মানুষকে পায়ের নীচে দাবাইয়া রাখে—দেশের সীমা আঁকিয়া, শ্রেণীর ব্যবধান রাখিয়া। কিন্তু এই যে রাশীকৃত কৃত্রিম ব্যবধান সে নিজেই গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, সে কি নিজেই তাহা অনুভব করেনা? এই অপমান কি একখানা কালি-মাখা অশুচি হাত ছোঁয়াইয়া তাহাকে অপবিত্র করিয়া দেয় না? স্বহস্তে এই যে পঙ্ক-তিলক ললাটে সে আঁকিয়া লইল, এ অগৌরব আর কতদিন সে বহন করিবে?

—না, বেশিদিন নয়! মুকুল অস্থিরের মতো পায়চারী করিতে লাগিল। এ অসঙ্গতি থাকিতে পারে না। ইহাকে সে ভাঙিবে, চূর্ণ করিবে, নূতন জগৎ, নূতন পৃথিবীকে জাগাইয়া তুলিবে। মুকুল বিপ্লবের অগ্রদূত, ঘর তাহাকে আকর্ষণ করে নাই। সে তো সাধারণের মতো আজ আর গড্ডলিকাস্রোতে অনিবার্য ধ্বংসপরিণতির পথে ভাসিয়া যাইবে না, ইহার মধ্যে সে অসাধারণ হইয়া তাহার ব্যক্তিত্বে তাহার শক্তিতে এই স্রোতের গতি ফিরাইবে। যাহারা অনিবার্যভাবে মরিতে চলিয়াছে, তাহাদের সে মৃত্যুকে নব-জীবনের সঞ্জীবনী দিয়া বাঁচাইয়া তুলিবে; পৃথিবী জুড়িয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারীকে সে নব-যুগের সভাপ্রাঙ্গণে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিবে। সে কেন পারিবে না? পৃথিবীর মানচিত্রে এই যে প্রত্যহ নতুন করিয়া রঙ পড়িতেছে, এই যে দিনের পর দিন পৃথিবীর রূপ বিবর্তিত হইয়া

চলিয়াছে, এই রূপান্তর আনিতেছে কাহারা? তাহারা তাহারই মত, একটুও স্বতন্ত্র, একটুও বিভিন্ন নয়! মুকুল নিজের মনেই আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"এ মৃত্যু ছেদিতে হবে এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জ পুঞ্জীকৃত জড়ের জঞ্জাল
এই মৃত আবর্জনা—"

অনাগত যুগের কল্পনায় মুকুলের স্বপ্নালু নয়ন তখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটি ব্যক্তি তখন এই নিশীথ রাত্রে একটি বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিল।

সে নন্তু। সুরেন মজুমদার কাল তাহাকে শাসাইয়াছেন, সে নাকি তাঁহার খেজুর রস চুরি করিয়াছে। গালাগালি তো করিয়াছেনই, সেই সঙ্গে আরও বলিয়া দিয়াছেন যে, সে যদি ভবিষ্যতে আর কখনও এমন দুঃসাহস করে, তাহা হইলে তিনি মারিয়া তাহার ঠ্যাং ভাঙিয়া দিবেন। তিনি নাকি এসব বাঁদরকে ভালো করিয়াই শায়েস্তা করিতে জানেন। পঁচিশ বছর ডেপুটিগিরি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার কাছে চালাকি চলিবে না— হুঁ হুঁ!

কিন্তু সুরেন মজুমদার তো আর বারো মাস গ্রামে থাকেন না, তাই নন্তুকে চেনেন নাই। তাঁহার জ্ঞান চক্ষুটা একবার ভালো করিয়া ফুটাইয়া দিতে হইবে।

আপাতত সেই সদুদ্দেশ্য লইয়াই নন্তু সদলবলে সুরেন মজুমদারের বাগানে আসিয়া ঢুকিয়াছে। এক হাঁড়ি রসও যদি রাখিয়া যায়, তাহা হইলে কালই সে তাহার নাম বদলাইয়া ফেলিবে। ওঃ, ডেপুটি! ওরকম অনেক ডেপুটিকে সে মাঠ হইতে ঘাস খাওয়াইয়া আনিতে পারে।...

রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া মুন্সী সাহেব উঠিয়া বসিল।

এই শীতের রাত্রেও তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে, বুক ধড়ফড় করিতেছে। কী বিশ্রী স্বপ্ন, অতীতের সেই বিস্মৃত ইতিহাস! মুন্সী সাহেব কোনদিন কি তাহা ভুলিতে পারিবে না! তাহার চিন্তার অবচেতনায় সে স্বপ্ন একটা চিরন্তন বেদনা, একটা অসহ্য দুরারোগ্য মর্ম পীড়ার মতোই জাগিয়া আছে যে।

দশ বৎসর! কত দীর্ঘ সময়—কালের পাণ্ডুলিপিতে কত এলো-মেলো লেখা! সেই এলোমেলোর ভিড় পার হইয়া এতদিনের জমিয়া থাকা এত ভালোমন্দ, বাধা-বন্ধের সীমানা অতিক্রম করিয়া মন অতি অনায়াসেই চক্ষের পলকে দশ বৎসর আগে ফিরিয়া যায়। মনে হয়, সে অতীত নয়, সে সুদূর নয় মাত্র কয়েক দিন—কয়েক দণ্ড—কয়েক মুহূর্ত পূর্বেকার ইতিহাস।

বাহিরে অন্ধকারে আড়িয়ল খাঁ নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে, ভাঙা পাড়ের গায়ে জল আসিয়া কল্‌কল্‌ করিয়া বাজিতেছে, নারিকেল গাছগুলি মর্মরিত হইতেছে। জোয়ারে উছলাইয়া-ওঠা জল একেবারে সাহেবপুর হাটের তলা পর্যন্ত আসিয়াছে, বালির চড়াটা ডুবিয়া গিয়াছে।...

...নিশীথ রাত্রি—ডকে কাজ চলিতেছে, এত রাত্রেও কারখানা হইতে লোহার ট্রলি যাতায়াত করিতেছে। হঠাৎ বয়লারে আগুন লাগিল।

লোহার কঠিন কারাগারের মধ্যে যে দৈত্যটা বন্দী হইয়া নিরুদ্ধ আক্রোশ অন্তরে অন্তরে বহন করিয়া মানুষের সেবা করিয়া আসিতেছে, সেই দৈত্যটা কেমন করিয়া যেন হঠাৎ মুক্তি পাইয়া বসিয়াছে! তাহার এতদিনের সঞ্চিত বিক্ষোভ প্রলয়ের মূর্তি ধরিয়া আগুনের লেলিহ

জিহ্বায় গর্জিয়া উঠিল! করোগেট্ টিন শাঁ শাঁ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, লোহার বল্টুগুলি জ্বলন্ত শেলের মতো ছিট্‌কিয়া পড়িতেছে। আগুনের রক্ত দীপ্তিতে কালো আকাশ ভয়ে শীর্ণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।...

দেখিতে দেখিতে কুলি কোয়ার্টার্সে সে আগুন ছড়াইয়া পড়িল। কলরবে এবং উত্তাপে যখন মুন্সী সাহেব জাগিয়া উঠিল, তখন দরজা জানালায় হু হু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। পাশের ঘরে আছে স্ত্রী রাহেলা এবং তাহার সদ্যোজাত শিশুসন্তান!

পাশের ঘর বলিতে তখন জ্বলন্ত একটা অগ্নিকুণ্ড! আর তাহারই মধ্য হইতে পোড়া মাংসের তীব্র গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। মুন্সী সাহেবের সমস্ত চেতনার উপর দিয়া ভূমিকম্প নাচিয়া গেল। পাগলের মতো আগুনের দিকে সে ছুটিয়া গেল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, রাহেলা!

কিন্তু কোথায় রাহেলা! ঝন্ ঝন্ করিয়া গায়ের উপর একরাশ লোহা-লক্কড় নামিয়া আসিল—চেতনা হইল ছত্রিশ ঘণ্টা পরে, হাসপাতালে। কারখানা এবং কুলি কোয়ার্টার্সের আগুন ততক্ষণে হয়তো নিবিয়াছে, কিন্তু মুন্সী সাহেবের অন্তরের আগুন সেই হইতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বলিয়া চলিয়াছে—মৃত্যু পর্যন্তই তা নিবিবে না!

মুন্সী সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিল, রাহেলা! নির্জন আড়িয়ল খাঁর উপর দিয়া সে চীৎকার শূন্য দিগন্তে হা হা করিয়া বহিয়া গেল।...

আর জাগিতেছিল টোনা—আমাদের বৈরাগী পাড়ার শ্রীকৃষ্ণ।

দিনকাল এখন বদলাইয়া গিয়াছে, বাঁশী বাজাইলেই গোপিনীরা আর কুল-শীল-মান ত্যাগ করিয়া কুরঙ্গিনীর মতো বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া আসে না। বরঞ্চ তাহাদের পিতা-পতিরা যে লগুড় লইয়া তাড়াইয়া আসে,

সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। টোনা অনেকবার মার খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, দুই চার ঘা মধ্যে মধ্যে পিঠে না পড়িয়াছে তা-ও নয়।

তা এসব ব্যাপারে প্রহারের ভয় করিলে চলে না। নিষিদ্ধ প্রেমের মাদকতা যে কী পরিমাণে উগ্র এবং হৃদয়গ্রাহী, বৈষ্ণব মহাজনবৃন্দ রসাইয়া রসাইয়া এবং ইনাইয়া বিনাইয়া সে কথা বহুবার বলিয়া গিয়াছেন। কীর্তনের চর্চা করিবার অবসরেও সে সব বিষয়ে তাহার প্রচুর জ্ঞান অর্জন করিবার সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়াছে।

মধু মণ্ডল কাল জেলায় গিয়াছে, ঘরে তাহার মেয়ে আছে পাঁচী। টোনা আস্তে আস্তে শিকারী বিড়ালের মতো গুঁড়ি মারিয়া ঘরের পিছনে আসিয়া উপস্থিত হইল। জায়গাটা একটা উঁচু ঢিপির মতো, চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল থাকিলেও বেশ পরিষ্কার।

টোনা আস্তে একটা শিস দিল। দুইবার—তিনবার। তৃতীয়বার শিসের সঙ্গে সঙ্গেই খুট্ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল ঘরের এবং নিঃশব্দ সতর্ক পায়ে পনেরো ষোলো বছরের একটি মেয়ে বাহির হইয়া আসিল। কালো হইলেও সে সুশ্রী। অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না, না হইলে দেখা যাইত, নিষেধের ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ, ভীত তাহার চোখের দৃষ্টি। আশঙ্কায় তাহার বুক দুর্ দুর্ করিতেছে। মধু মণ্ডল একটিবার টের পাইলে তাহাকে কাটিয়া খালের জলে ভাসাইয়া দিবে। তবে মাকে তাহার ভয় নাই। ও বাড়ির কীর্তি কাকা যে সুবিধা পাইলেই মায়ের কাছে যাতায়াত করে সে কথা সে-ও বাবাকে বলিয়া দিতে পারে। সেইজন্যই মা টের পাইলেও তাহাকে কিছু বলিতে সাহস পাইবে না।

পাঁচী বাহির হইয়া আসিতেই টোনা তাহাকে খপ করিয়া কাছে

টানিয়া আনিল। কহিল: এসেছিস? আমি ভাবলুম বুঝি ঘুমিয়েই পড়লি।

না, ঘুমাইয়া সে পড়ে নাই। ঘুমাইয়া পড়িবেই বা কী করিয়া! টোনা তাহার রক্তে রক্তে যে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে তাহাতে ঘুমানো কি অতই সহজ? সে যে কত অধৈর্য হইয়াই প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে-কথা সে ছাড়া আর কে জানে!

তবু পাঁচী মুখ একটু সরাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, তুমি বুঝি আজও মদ খেয়ে এসেছ?

—বেশি নয় অল্প। তুই যদি রাগ করিস, আর খাব না।

ঝোপ জঙ্গল ঘেরা নির্জন ভিটা আর অন্ধকার। শুকনো পাতার নিবিড় আস্তরণ পড়িয়া যেন ওদের বাসর রচনা করিয়াছে। কালো আকাশ ঘন হইয়া ওদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে।......

মধু মণ্ডলের বাড়ীর উপর দিয়া রাধু চৌকিদার হাঁক পাড়িয়া গেল। পাঁচী আরো নিবিড় করিয়া টোনাকে জড়াইয়া রাখিল, রাধু চৌকীদার টের না পায়।

আকাশে নক্ষত্র-চক্র ঘুরিয়া চলিল।

ইহা একটি দিনের ইতিহাস।

তারপর এই ইতিহাসের অনুবর্তন করিয়া দিনের পর দিন বহিয়া চলিল। প্রথমে যেগুলি বিচিত্র মনে হইয়াছিল, দৈনন্দিনের চলচ্ছন্দে তাহারা অতি সহজ, অতি সাধারণে রূপান্তরিত হইয়া গেল। প্রথম পরিচয়ের অঙ্কটা যেই শেষ হইল, তাহার পরেই সেই পরিচিত নাটক। পাত্র পাত্রীরা সকলেই এক—কোনো বৈচিত্র্য নাই, কোনো বৈলক্ষণ্য নাই। কাল তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিল।

কিন্তু কাল তাহার পুনরাবৃত্তি না হয় করুক, এই কালের চাকাটাকেই উল্‌টা মুখে ঘুরাইয়া দিয়া নূতনত্বের প্লাবন আনিবার কল্পনা যাহারা করে, চিরন্তনকে যাহারা বিপ্লবের মধ্য দিয়া বৈচিত্র্যমুখী করিতে চায়, তাহারা এই পুনরাবর্তের দাসত্ব স্বীকার করিতে রাজী হইল না।

এবং রাজী হইল না বলিয়াই এই গ্রামটিকে কেন্দ্র করিয়া আলোড়ন জাগিল। প্রফুল্ল আসিল বিপ্লবের অগ্রদূত হইয়া; তাহার পাশে দাঁড়াইল মুকুল, রবি এবং আরো অনেকে। এমন কি তাদের মধ্যে নন্তুও।

প্রফুল্ল প্রস্তাব করিল, ইস্কুলের মাথায় একটা জাতীয় পতকা বসাইয়া দেওয়া হউক।

ইস্কুল কমিটির ঘরোয়া মিটিং। ভীড় খুব বেশি না থাকিলেও সামান্য যে কয়জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই এমন হল্লা বাধাইয়া বসিলেন যে, বলিবার নয়! ব্রিটিশ রাজত্বে বাস করিয়া এমন একটা দুঃসাহসিক প্রস্তাব যে কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, এটা তাঁহাদের কল্পনারই বাহিরে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর যেখানে অনেকখানি নির্ভর করিতে হয়, সে ক্ষেত্রে এসব এলোমেলো আবদার খাটিবে কেন!

সুতরাং প্রথমে দাঁড়াইলেন রামকমল চাটুয্যে। বহুকাল পুলিশের দারোগাগিরি করিয়া সাধু অসাধু উপায়ে তিনি বেশ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়াছেন। সরকারের ডাকসাইটে কর্মচারী হিসাবে যথেষ্ট নাম পাইয়াছেন; দেশবন্ধুর আমলে স্বদেশী সভায় মারপিট করিয়া শেষ পর্যন্ত মাস কয়েক অস্থায়ীভাবে ইন্‌স্পেক্টরীও করিয়াছিলেন। সুতরাং আঁতে ঘা পড়িয়াছিল তাঁহারই সব চাইতে বেশি।

টেবিলে কিল মারিয়া তিনি কহিলেন, বন্ধুগণ! এর চাইতে আর কী ভয়ঙ্কর কথা হতে পারে, বলুন? এটা ইস্কুলের ব্যাপার, আর ছাত্রদের

অধ্যয়নই একমাত্র তপস্যা। সুতরাং এসমস্ত সুকুমারমতি বালকদের মনে রাজনীতির দুর্বুদ্ধি জাগিয়ে দেওয়া কেন! এসব রাজনীতির ব্যাপার, কংগ্রেসেই ভালো মানায়, ইস্কুলে নয়। আমাদের নতুন হেড মাস্টার মশাই বিজ্ঞ লোক, এই ক'দিনেই ইস্কুলটার চমৎকার উন্নতি করেছেন। কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে যে এমন একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বেরোবে, এ আমরা কিছুতেই আশা করি না। কি বল রাসুদা, তুমি তো ইস্কুলের সেক্রেটারী, কথাটা ঠিক নয়?

. রাসু সেন মাথা নাড়িয়া বলিলেন: ঠিকই তো।

অনাথ কবিরাজ এক পাশে ঝিমাইতেছিলেন। তিনি ইস্কুল কমিটির মেম্বার নন, আসিয়াছেন রাসু সেনের সঙ্গে। এরকম তিনি সর্বদাই আসিয়া থাকেন। চোখ বুজিয়া তিনি রাসু সেনের কথায় সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

অতঃপর দাঁড়াইলেন সুরেন মজুমদার। তিনি কহিলেন, দারোগা বাবু এই মুহূর্তে যা বললেন, তা আমি পূর্ণ সমর্থন করি (এখানে রামকমল মুখ বাঁকা করিলেন, তিনি যে দারোগা, একথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়া সুরেন মজুমদার যেন সকলের সম্মুখে নিজের ডেপুটিত্বই জাহির করিতে চান)। তিনি একটা জায়গা সামলে নিয়েছেন; দারোগা, লোয়ার গ্রেডের কর্মচারী (রামকমল দ্বিতীয় বার মুখ বিকৃত করিলেন), তাই স্পষ্ট করে বলতে সাহস পাননি। কিন্তু আমি একটা ফার্স্ট গ্রেড্ ডেপুটি (রামকমল তৃতীয় বার মুখ ভঙ্গী করিলেন), আমি স্পষ্ট কথা বলিতে ভয় পাইনা। আমি এটা জোর করেই বলতে পারি, ইণ্ডিয়ান্ কংগ্রেস একটা গুণ্ডার আড্ডা হয়েছে, Yes, they are all hooligans (পিছন হইতে রবি বলিল, "শেম-শেম")—কিন্তু "শেম-শেম" আর যাই বলুন, আমার মুখে স্পষ্ট কথা। ভারতের নেতারা

ছেলে-ছোকরাদের কী শেখাচ্ছে? শেখাচ্ছে ইস্কুল বয়কোট করা, মাথায় লাঠি ঝেড়ে দেওয়া, আর রাত-বিরেতে প্রতিবেশীর ফল-পাকড় উজোড় করে দেওয়া, খেজুর রসের হাঁড়ি সাবাড় করা। সে আর বলবেন না মশাই, রস খাবি খা, তা নয় হাঁড়ি-কলসি ভেঙে যা তা কাণ্ড! ফের যদি আর একদিন আমার রস চুরি যায়, তা হলে আমি নির্ঘাৎ থানায় ডায়েরী করাব, এ কথা—

সুরেন মজুমদারের মনের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যথার জায়গা ছিল, রাজনীতি এবং ইস্কুল সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি মনের ভুলে সেই খানটাতে হাত দিয়া ফেলিয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্ট্ গণু মিঞা বাধা দিয়া কহিলেন, আউট্ অব্ অর্ডার্!

সুরেন মজুমদার উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, আউট্ অব্ অর্ডার মানে? আমার রস চুরি যাবে, আর আপনারা বসে পার্লামেণ্টারী আইন ঝাড়বেন! ওসব চলবে না মশাই, এর যদি একটা ব্যবস্থা না করেন তো আমি ইস্কুলের নামে ইন্‌সপেক্টর অফিসে রিপোর্ট লিখব। আমিও যা তা ডেপুটি নই, পঁচিশ বছর সরকারের নুন খেয়েছি—

কিন্তু তিনি কথাটা শেষ করিবার পূর্বেই কোথা হইতে এই দিবা-দ্বিপ্রহরেই প্রচণ্ড শব্দে শিয়াল ডাকিয়া উঠিল। অবশ্য সেটা সত্যই শিয়াল নয়। এসব অনুকৃতির ব্যাপারে নন্তু বিশেষজ্ঞ।

সভায় একটা চাপা হাসির গুঞ্জন উঠিল। সুরেন মজুমদার ক্ষেপিয়া লাফাইয়া উঠিলেন, কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ—তারপর আর দ্বিতীয় কথাটীর অবকাশ কাহাকেও না দিয়াই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেলেন তিনি।

গণু মিঞা কহিলেন, আহা-হা-হা, মজুমদার মশাই চলে গেলেন যে!

মজুমদার মশাই ফিরিয়াও চাহিলেন না।

শত্রুপক্ষেরা নীরব রহিল, মিত্রপক্ষ হইতে রামকমল মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, যাক, মাথা খারাপ হয়ে গেছে লোকটার। ডেপুটি-দারোগার তুলনামূলক সমালোচনা তাঁহার মর্মে মর্মে বিদ্ধ হইতেছিল। আর দশ বছর সার্‌ভিস করিলে তিনি নিজেই কি একটা ডেপুটি হইয়া যাইতে পারিতেন না।

প্রফুল্ল বিস্মিত মুখে সুরেন মজুমদারের গন্তব্য পথের দিকে চাহিল, মুকুল অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতে লাগিল এবং রবি এমন-ভাবেই গলা ছাড়িয়া হাসিতে সুরু করিল যে, আশঙ্কা হইতে লাগিল, কোন সময়ে তাহার পেটের নাড়ি-ভুঁড়িগু'ল এক সঙ্গে পটাৎ করিয়া ছিঁড়িয়া যায় বা।

গণু মিঞা কহিলেন, অর্ডার অর্ডার।

এইবারে উঠিলেন নরেশ কর। স্বদেশী যুগে গলা-ফাটানো বক্তৃতা দিয়া তিনি নাম করিয়াছিলেন, সেই বিরাট প্রতিভা সুযোগের অভাবে এতদিন নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল। সুশীল মাস্টার কিংবা অন্যান্য যাকে তাকে ধরিয়া রাজনীতি বোঝানো ব্যাপারটা চলিত বটে, কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইবার মতোই নরেশ কর তাহাতে সান্ত্বনা পাইতেন না। এইবার ভালো করিয়া তিনি গোঁফজোড়া চুমরাইলেন, চাদরটাকে কাঁধের উপর তুলিয়া লইলেন, তারপর একবার গলা খাঁকারি দিয়া বলিতে সুরু করিলেন। মনশ্চক্ষে তিনি দেখিতেছিলেন, প্রসারিত দেশবন্ধু পার্ক, বিশাল জনতা, সম্মুখে মাইক্রোফোন; এবং তিনি উদ্দীপ্ত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন:

বন্ধুগণ, একটু আগেই জাতীয় পতাকা উত্তোলনের (মানে-ইস্কুলে) বিরোধিতা করে চাটুয্যে মশাই আর মজুমদার মশাই যে সমস্ত কথা বলে

গেলেন, সে সব যুক্তি যে কত বালকোচিত, তা বোধ হয় বলে না বোঝালেও চলে। সত্যি বলতে কি, তাদের দৌর্বল্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আজকালকার দিনে রাজনীতি না হলে কেমন করে চলবে? আপনারা একবার পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন —(তিনি এমন করিয়াই দেখাইলেন—যেন তাঁহার ঠিক পাশেই পৃথিবীর মানচিত্র ঝুলিতেছে) দেশে দেশে যুগে যুগে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কত পরিবর্তনই ঘটে গেল! আয়ার্লণ্ড, আমেরিকা, অসভ্য জাপান, স্পেন, রক্তাক্ত রাশিয়া। আর এই সমস্ত বিপ্লবের তরঙ্গ এনেছে কারা? এনেছে তারাই—যারা ছাত্র, যারা নব যুগের অগ্রদূত—

পিছন হইতে রবি বলিল, হিয়ার, হিয়ার!

উৎসাহিত হইয়া নরেশ কর বলিয়া চলিলেন, হাঁ, তারাই, সেই ছাত্রেরাই চিরকাল এই বিপ্লব এনেছে। তারাই নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে সমস্ত পৃথিবীকে! জানেন তো, কবি বলেছেন:

"সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করনি?—"

লাইন দুটির প্রতি নরেশ করের পক্ষপাত যে অত্যন্ত প্রবল, একথা যখন-তখন বুঝিতে পারা যায়। নরেশ কর বলিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ কখনো কবিতা লিখে থাকলে লিখেছেন এই একটি, "পুণ্য পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে"—

তিনি বলিয়াই চলিলেন:

—তারা বাঁদরামো করে বেড়াবে, সেইখানেই তো তাদের প্রাণ। তারা খেজুর রস চুরি করবে, সেইখানেই তো তাদের বীরত্ব: এমনি করে তারা নেতা হবে, হবে মাইকেল কলিন্স, হবে ডি ভ্যালেরা, হবে ওয়াশিংটন, হবে ম্যাট্‌সিনি, হবে গারিবল্‌ডী, হবে লেলিন, হবে

স্ট্যালিন, হবে ট্রটস্কি, হবে বিবেকানন্দ—উত্তেজনায় নরেশ কর হাঁপাইতে লাগিলেন, হবে রামকৃষ্ণ, হবে ত্রৈলঙ্গ—

পিছন হইতে কে যোগ করিয়া দিল, হবে নরেশ কর, হবে ভুষণ্ডী কাক—

নরেশ কর চোখ পাকাইয়া কহিলেন, কে ?

প্রত্যুত্তরে উকু উকু শব্দে খানিকটা উল্লুকের ডাক কানে আসিল।

গন্নু মিঞা তটস্থ হইয়া কহিলেন, অর্ডার ! অর্ডার !

রবি হাঁকিয়া কহিল, এই নন্তু স্টুপিড ! কিন্তু কোথায় নন্তু ! কাছাকাছি মাইল খানিকের মধ্যে তাহার আভাস নাই। নরেশ বিরক্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তারপর হিংস্রভাবে গোঁফ জোড়াকে চুমরাইতে লাগিলেন। নাঃ, ছেলেগুলা একেবারে বাঁদর। দুই দণ্ড চুপ করিয়া বসিয়া যে দুইটা ভালো কথা শুনিবে, এমন স্বভাবই তাহাদের নয়। এই জন্যেই তো জাতিটার কিছু হইতেছে না।

এতক্ষণে প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইল। এই প্রহসনের সমাপ্তি করা দরকার। জিজ্ঞাসা করিল, মুকুলবাবু কিছু বলবেন ?

মুকুল হাসিয়া বলিল, না। আপনি বললেই আমার বলা হবে।

—রবি বাবু ?

রবির মুখ এক ধরণের বিনয়ে বিগলিত হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। বলিবে বই কি, নিশ্চয় বলিবে ! কিন্তু চিরন্তন নিয়ম অনুসারে সে বারকয়েক দ্বিধা করিল, আর একবার সাধিলে তবে সে দাঁড়াইবে, ইহাই প্রথা।

কিন্তু মুকুল গোল বাধাইয়া দিল। রবি দাঁড়াইয়া উঠিবার উপক্রম করিতে সে কহিল, না, না, রবি আবার কী বলবে, আপনিই বলুন।

রবি স্তম্ভিত হইয়া গেল, মুকুল যে সত্যসত্যই এত বড় একটা ঘা

মারিয়া তাহাকে বসাইয়া দিবে, সে কথা সে যেন এখনো বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

রবি মুকুলের দিকে তাকাইতে গেল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি আসিল প্রতিহত হইয়া। মুকুল তাহার দৃষ্টির প্রতিদান দিল। উগ্রতায় নয়—শান্ত অবজ্ঞায়। তাহার দৃষ্টি পাথরের মতো শীতল, মনটাও বোধ হয় তাহার ওই রকম দৃঢ় নিরুত্তাপ। সেখানে আঘাত করিলে নিজেকেই প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

প্রফুল্লও আর দ্বিতীয়বার ফিরিয়া প্রশ্ন করিল না, সে এবার নিজেই টেবিলটার দিকে আগাইয়া গেল। রবি মাটির দিকে তাকাইয়া নিজের মনেই বিড় বিড় করিয়া কী একটা বলিল, ভালো করিয়া সেটা শুনিতে পাওয়া গেল না।

প্রফুল্ল আস্তে আস্তে বলিয়া চলিল, তাহার কণ্ঠে উত্তেজনা নাই, উত্তাপ নাই। সে কহিল: একটা জাতীয় পতাকার ব্যাপারে রাজনীতির সম্বন্ধে এত কথা কী করে আসে, তা বুঝতে পারলুম না। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগাযোগ নেই, এ বিষয়ে আমি আগে থেকেই শ্রীযুত প্রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য সদস্যদের আশ্বাস দিয়ে রাখি। প্রত্যেকেরই জাতিগত একটা বিশেষত্ব আছে, আর সেই বিশেষত্ব তার পতাকার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বিশেষত্ব মানেই বিদ্রোহ নয়, এ কথা আপনারা কেন ভুলে যাচ্ছেন?

প্রফুল্ল বলিয়া চলিল: আর এ থেকে আমার এ কথা মনে করতেও কষ্ট হয় যে, এ জন্য আমাদের সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হবেন। এতখানি অনুদারতা এতবড় বীর জাতির যে থাকতে পারে, কোনও রাজভক্ত প্রজারই এ রকম ধারণা রাখা উচিত নয়।

রামকমল তন্ময়ভাবে মাথা নাড়িলেন। মুকুল কৌশলটা লক্ষ্য

করিয়া কটাক্ষে একটু হাসিল, আর রবি—কথাটার গতি যে কোনদিকে চলিতেছে, সেটা ভালো করিয়া ধরিতে না পারিয়া বিস্ফারিত চোখে প্রফুল্লের মুখের দিকে চাহিয়াই রহিল।

প্রফুল্ল কহিল, কোরাণ শরীফে আছে—

চকিত হইয়া গণু মিঞা চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

—কোরাণ শরীফে আছে, যে নিজের ধর্ম বা জাতিকে সম্মান দিতে জানেনা, সে আল্লার কাছে গুনাহ্‌গার হয়। সুতরাং জাতীয় পতাকার মতো এমন একটা দেশগত ধর্মগত ব্যাপারে আপনারা কেন যে এমন পিছিয়ে যেতে চাচ্ছেন, আমি তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

গণু মিঞা বলিলেন, ঠিক ঠিক।

—সেই জন্যই আমি বলতে চাই যে, ইস্কুলে একটা জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হলে কারো কোনও আপত্তি থাকবে না—থাকা উচিতও নয়। আর ইস্কুলের সেক্রেটারীরও এটা অবশ্য কর্তব্য যে—

রাসু সেন উদ্‌গ্রীব হইয়া কান খাড়া করিয়া রাখিলেন।

—এটা অবশ্য কর্তব্য যে, অবিলম্বে তিনি একটা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করুন। এ বিষয়ে সেক্রেটারী কী বলেন, আমরা শুনতে চাই।

প্রফুল্ল বসিয়া পড়িল, রাসু সেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি কী বলিবেন? সেক্রেটারীর কর্তব্য—এই একটি কথাতেই তাঁহার সমস্ত বক্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছিল।

বার কয়েক তো-তো করিয়া রাসু সেন বলিলেন, বিজ্ঞ হেড মাস্টার মশাই যা বললেন, তা খুবই ঠিক। আমি এ প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন করি। যদি সরকারের কোনও বিরোধিতা না ঘটে, আর ইস্কুলের এইডটা কাটা না যায়, তা হলে অনায়াসে কালই একটা জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া

চলে। এটা যখন সেক্রেটারীর কর্তব্য, তখন এ সম্বন্ধে আর বিলম্ব করা ঠিক নয়।

অনাথ কবিরাজের নেশা এতক্ষণে গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল। জিনের ছেঁড়া কোটটির উপর তাঁহার মাথাটি ঝুঁকিয়া নামিয়া আসিয়াছে, কুঞ্চিত ভাঁজ-করা চামড়া যেন গালের দু'পাশ হইতে ঝুলিয়া পড়িতে চায়। চটকা ভাঙিয়া গিয়া তিনি বলিলেন: ঠিক ঠিক।

তারপর অনায়াসেই জাতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রস্তাবটা পাশ হইয়া গেল।

প্রফুল্ল সকলের দুর্বল জায়গাগুলি ভালো করিয়াই চিনিয়া লইয়াছিল। সেই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সে ইস্কুলটার সর্বাঙ্গীন সংস্কার করিবার ব্রত গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে স্কুলে একটা ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত হইল; ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক মনোভাব প্রসারিত হইতে লাগিল এবং আরও অনেক কিছুই ঘটিয়া চলিল, এখানে যাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিবার অধিকার নাই।

কিন্তু তপন ইহাদের বাহিরে। সে নিজের সীমার মধ্যেই স্বতন্ত্র হইয়া আছে। সম্প্রতি সে তাহার মনের এই দিকটাই আবিষ্কার করিয়া বসিয়াছে যে, সে শুক্লার প্রেমে পড়িয়াছে।

প্রথমটা তপন বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। পরক্ষণেই মনে হইল, ইহার চাইতে সহজ, ইহার চাইতে স্বাভাবিক পৃথিবীতে আর কী হইতে পারে। একজন মানুষকে কোনো না কোনো সময় ভালো লাগিতে হইবেই—সে ভালো লাগা দেহ মাত্রেরই ধর্ম, মনেরও; সুতরাং বিস্ময়টা তাহার স্তিমিত হইয়া আসিতে মাত্র কয়েকটি মিনিট সময় লাগিল।

কিন্তু ইহার কী মূল্য, কী ইহার সার্থকতা।' ভালো লাগা কতক্ষণ

বা থাকে। একটা দুর্বল মুহূর্তে সাময়িকভাবে মনকে সংক্রামিত করে, কয়েক ছত্র কবিতার মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়। কিছুদিন কল্পনা বিলাসের মধ্যে তাহা সীমাবদ্ধ থাকে, ব্যস—ওই পর্যন্তই! তারপর দৃষ্টির বাহিরে যাইবামাত্র তাহা মিলাইয়া যায়, সে কল্পনার সঙ্গে সাবানের একটা রঙীন ফেন-বুদ্বুদের কোন তফাৎ নাই। শুক্লার সঙ্গে তাহার পরিচয়ের সুযোগই বা কয় দিনের! এই তো দু তিন মাসের জন্য সে চেঞ্জে আসিয়াছে, শরীরটা না সারা পর্যন্ত গ্রামে থাকিবে, তারপর সেদিন প্রয়োজন ফুরাইবে, অত্যন্ত অবলীলাক্রমেই চলিয়া যাইবে। পিছন ফিরিয়া তাকাইবে না, একটিবার দ্বিধা করিবে না; কলিকাতার বিদ্যুৎ উৎসবের উজ্জ্বলতার মধ্যে এ জীবন একটা ছায়া-ছবির মতো দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হইবে। পথের প্রীতিকে সে পথের ধূলার মতোই ঝাড়িয়া ফেলিয়া যাইবে, আঘাত শুধু জমা থাকিবে তাহার জন্য।

তবুও কী যে এতটা দুর্বলতা আসিতেছে! সব কথা জানিয়া এবং বুঝিয়াও কবি তপন, আত্ম-সচেতন তপন তাহা মনে রাখিতে পারে না। নিজের কাছেই সে নিজে কতটা বন্দী হইয়া আছে, একথা আগে অনুমান করিতে পারে নাই।

সেই জন্য সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবেই সে বড়বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িল এবং তাহার পা দুখানা এতটুকু ইতস্তত না করিয়াই স্বাভাবিক সংস্কার বশে তাহাকে সোজা শুক্লার ঘরের দিকে টানিয়া লইল। এ বাড়ীর সঙ্গে আশৈশব তাহার নিকটসম্বন্ধ। এখানে সে ঘরের ছেলের মত সহজ।

শুক্লা আয়নার সামনে বসিয়া প্রসাধন করিতেছিল, দরজায় ঘা পড়িল টক্‌টক্ করিয়া। শুক্লা বলিল, কে? এসো।

ঘরে ঢুকিল তপন।' আশ্চর্য—একটু আগেই শুক্লাকে লইয়া যত

কথা সে ভাবিতেছিল এবং যে সমস্যাটার সমাধান করিবার জন্য তাহার সমস্ত অন্তরটাই আকলি-বিকুলি করিতেছিল, এই মুহূর্তে সেই ভাবনা বা সমস্যাটার কোন অস্তিত্বই সে মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। মনের এমন একটা সংযত স্তিমিত অবস্থা তাহার আসিয়াছে যে, যে সমস্ত কথা এতক্ষণ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাকে পীড়ন করিতেছিল এবং যে জন্য সে ভাবিতেছিল শুক্লার সম্মুখে সে আজ কিছুতেই সহজ হইতে পারিবে না, তাহার এতটুকুও সে এখন স্মরণ করিতে পারিল না।

ঢুকিয়াই তপন আক্রমণের সুর ধরিল: নারী-প্রগতির এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অবদান।

শুক্লা চকিত হইয়া বলিল, কোনটা?

—এই প্রসাধন ব্যাপারটাই। বাপরে, কী একখানা টেবিলই সাজিয়েছ! যেন পারফিউমারীর দোকান।

—হুঁ, তুমি তো আছোই নারী-প্রগতির পেছনে লেগে।

—নারী প্রগতির পেছনে আমি লাগিনি, আমি লেগেছি সমস্ত পুরুষ জাতের ইন্টারেস্টের পক্ষে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ—জাতকে জাত যেখানে কেরাণীগিরি করে খায় এবং যাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মাসিক আয় গড়পড়তা পনেরো টাকা, সেখানে কেরাণী গিন্নিরা যদি পঁয়তাল্লিশ টাকার রুজ কেনেন, তা স্বামী বেচারাদের দড়ি-কলসির জন্যে কুমোরটুলির দিকে ছুটতে হয়।

শুক্লা চটিয়া গেল, ইঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা! মেয়েদের কাপড়ে তেল হলুদের দাগ দেখে আর গায়ে ইলিশ মাছের ঝোলের গন্ধ শুঁকে তোমাদের চোখ-নাক কন্‌ভেনশন্যাল হয়ে গেছে। এ সব ভাল জিনিস তোমাদের সইবে কেন!

—ভালো জিনিস! রক্ষা কর দেবি—তপন নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত দুখানি জড় করিয়া বলিল, তোমাদের শাড়ীর বিলিতী সেণ্টের ঝাঁজে ক্লোরোফর্মের মতো আমার মাথা ঘুরে যায়। তা তোমরা গায়ে এত সব যে চাপাচ্ছ, এতে করে লোকের কেবল মাথাই ঘোরাতে পারলে, জয় করতে পারলে না। আধুনিকতার সব চাইতে বড় ট্র্যাজেডি এইখানেই।

শুক্লা স্প্রে দিয়া খানিকটা সুগন্ধি তপনের নাকের উপর ছড়াইয়া দিল, থামো, বাক্যবীর থামো। এ সব চাপানোর ব্যাপার শুধু মাত্র আধুনিকতারই অবদান নাকি! তোমার সংস্কৃত কাব্যের নায়িকারা কী বলেন? তাঁরাও আমাদের থেকে কম যেতেন না। বরং তাঁদের সমারোহ ছিল আমাদের চাইতে অনেক বেশি। সেই যে মেঘদূত থেকে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন, না?

"কুরুবকের পরতো চূড়ো
কালো কেশের মাঝে,
লীলা-কমল রইতো হাতে
কি জানি কোন কাজে।
অলক সাজতো কুন্দ ফুলে
শিরীষ পরতো কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিতো
নব নীপের মালা।
ধারা যন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিতো কেশে,

লোধ্র ফুলের শুভ্র রেণু
মাখতো মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাকতো সাজে—”

তপন শিহরিয়া কহিল, সর্বনাশ, জিতেছ তুমি। আমি নিতান্ত দুর্মেধস্—তুমি যে সংস্কৃতে এম-এ দিতে যাচ্ছ, এ কথাটা কিছুতেই মনে রাখতে পারি না।

শুক্লা হাসিয়া বলিল, আচ্ছা হার স্বীকার যখন করেছ, তখন প্রসাধন-তত্ত্ব থাক। কিন্তু এমন অসময়ে আবির্ভাবের কারণটা জানতে পারি?

—তা পারো। কারণ কিছু নেই। ইচ্ছের বিরুদ্ধে চলে এলাম—পা দুটো টেনে নিয়ে এলো বলা যায়। আজকাল আমার যেন কী হয়েছে, তোমার সম্বন্ধে নিজেকে সব সময়—

এই পর্যন্ত বলিয়াই সে একটা প্রবল চমক বোধ করিল। সে কি আত্মপ্রকাশ করিতেছে? মাত্র কিছুক্ষণ আগেই তার পরিস্ফুট নির্মল বুদ্ধির আলোকে যেটাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা বলিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে, অসতর্ক অবস্থায় সেটাই কি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়?

তপন থামিয়া গেল।

কিন্তু তাহার মনে যতখানি দোলা লাগিয়াছিল, শুক্লার চিন্তা-চেতনা তাহার চাইতেও বেশি আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের মনকে বুঝিতে তাহার দেরী নাই,—পুরুষের অপেক্ষা সহজেই মেয়েরা মনের গতি-প্রকৃতিকে অনুধাবন করিতে পারে। তবুও সে-ও এই বলিয়াই নিজেকে প্রবোধ দিয়াছে যে, পথেই যাহার জন্ম এবং আগে পিছনে

দুইটি দিন পরে যাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে, তাহাকে লইয়া চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলিতে পারে না। সর্বোপরি তপন কবি; তাহাকে পূজার নৈবেদ্য ধরিয়া দিলেও সে গ্রহণ করিবে কি না, আগে হইতেই সে কথা অনুমান করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু—

তাহার গলা শুকাইয়া উঠিল, বুকে স্পন্দন দ্রুততর হইল; হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আমাকে কি মনে হয় তোমার? বাঘ ভালুক বলে ভ্রম হয় নাকি?

তপন নীরস স্বরে বলিল, যদি হয়, তা হলে দোষ কী?

—তা হলে তুমি শঙ্করাচার্যের শিষ্য। সেই যে কী একটা শ্লোক আছে—

—আঃ, আবার সংস্কৃত আরম্ভ করলে! তোমার মনে রাখা উচিত, আমি নাস্তিক, দেব-ভাষার সঙ্গে প্রীতির বন্ধন আমার নেই!

—তা নয় না থাকল, কিন্তু সত্যিসত্যিই তুমি যে বৈরাগ্যমার্গে এতদূর এগিয়ে গেছ, সে তো আগে জানতে পাইনি।

—ভয় নেই, শঙ্করাচার্যের শিষ্য নই আমি। আমি মেয়েদের মূল্য দিই। যতটা তারা না পেতে পারে, তার চাইতে বেশিই দিই। আর সেই মেয়ে যেখানে খানিকটা অসাধারণ হয়ে ওঠে, সেখানে, সেখানে—

তপন সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের সাড়া পাইল। এই মুহূর্তে তাহার দেহের উত্তাপ যেন অস্বাভাবিক রকম বাড়িয়া উঠিতেছে, যেন সে কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে হারাইয়া ফেলিবে সম্পূর্ণভাবে। সে অস্বাভাবিক, সে অপ্রকৃতিস্থ।

শুক্লা ভীত মুখে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তপনের অসমাপ্ত কথাটা কী ভাবে যে শেষ হইবে, কে জানে! সে যেন একটা আকস্মিকের,

একটা ঝড়ের—এমন কী একটা পরম বিস্ময়ের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। নির্বাক জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি মেলিয়া সে তপনের দিকে চাহিয়াই রহিল।

বিদ্যুতের মতো তপন খাড়া হইয়া উঠিল। নির্জন দোতলা; বাহিরে ম্লানায়মান শীতের সন্ধ্যা! ঘরের মধ্যে পাণ্ডুর আলোয় তরুণী নারীর শঙ্কাতুর মুখখানা অপরূপ দেখাইতেছে, তাহার তন্বী সুঠাম দেহলতা কী করুণ ভঙ্গিতেই না টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

তপন দুই বাহু বাড়াইয়া দিল—তারপর শুক্লাকে কাছে টানিয়া আনিতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত যা দেরি! দেহের ঘন সান্নিধ্যে সে অনুভব করিল, তাহার বক্ষোবন্ধার ভয়ার্ত হৃদ-স্পন্দন তাহার নিজের উত্তেজিত রক্তধারার মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে। নির্বাক, ভীত, আশঙ্কা-পাণ্ডুর সেই মুখখানার দিকে চাহিয়া সে নিজেকে হারাইয়া ফেলিল। শুক্লার দ্রুত-নিঃশ্বাস তাহার গালে লাগিতেছে, তাহার দৃঢ় বাহু-বন্ধনে সে শিহরিয়া উঠিতেছে। মুখ নত করিয়া গাঢ় গভীর স্বরে তপন বলিল, সেখানে, সেখানে তাকে পেতে আমার লোভ হয়, তাকে নিষ্পিষ্ট চূর্ণ করে দেবার বাসনা জাগে! কিন্তু এ লোভ আমি জয় করব। অন্তর থেকে যাকে কামনা করি, বাইরের মোহে তাকে কোনোদিন চূর্ণ করতে চাইব না।

শুক্লা কথা বলিবে কী, তাহার যেন তখন একেবারে নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

একবার শুক্লার রক্তওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলাইয়া, পর মুহূর্তেই তাহাকে মুক্তি দিয়া তপন উর্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। পলকের মধ্যে সে যেন তাহার অপরাধের মাত্রা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সিঁড়ি বাহিয়া তাহার পায়ের শব্দ ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া আসিল।...

টেবিলটার গায়ে ভর দিয়া তেমনি পাথরের মূর্তির মতো শুক্না নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ওদিকে নীচের ঘরে তখন আর একটি কাব্য চলিতেছিল।

একটু আগেই বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা করিয়া রবি, মুকুল এবং অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গেরা বিদায় লইয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল টেবিলের ড্রয়ারটা চাবি দিয়া খুলিয়া ফেলিল, তারপর তাহার মধ্য হইতে অত্যন্ত সযত্নে এক গোছা বই বাহির করিল। এই সমস্ত বই এবং প্রচার-পত্রিকাগুলি এখন কাজে লাগাইতে হইবে। নিঃস্বার্থভাবে বা অর্থের অভাবে সে এখানে মাস্টারী করিতে আসে নাই। ডিস্ট্রিক্ট কমিটি যে কাজের ভার তাহার উপর চাপাইয়া দিয়াছে, ইস্কুলের চাকরীটার সুযোগ লইয়াই সে কাজটা সব চাইতে সহজ হইয়া উঠিবে। যে ব্রত সে জীবনে একান্ত করিয়াই গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উদ্‌যাপনের পথে প্রকাশ্যতার সুযোগ নাই; আলোর অধিকার যদি না-ই থাকে, তবে অন্ধকারের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া সে আর কী করিতে পারে?

তবে, ইহাই সান্ত্বনা যে, এ কাজে যাহাদের সহায়তা সে পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান রবি এবং মুকুলের উপর সে অনেকখানিই নির্ভর করিতে পারে। আশা হইতেছে, এক মাসের মধ্যেই গ্রামে একটা শক্তিশালী অর্গানাইজেশন গড়িয়া উঠিবে।

প্যাম্ফলেটগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে তাহার মনে হইল, দরজার কাছে কে যেন ছায়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া। আবছায়া অন্ধকারে তাহাকে দেখা যায় না, তাহার নিঃশ্বাস কিন্তু স্পষ্ট শোনা যায়।

সশব্দে ড্রয়ারটা বন্ধ করিয়া দিয়া শঙ্কিত সন্দিগ্ধ স্বরে প্রফুল্ল বলিল, কে?

নীলিমা আত্ম-গোপন করিতে পারিল না। সঙ্কোচ-জড়িত পায়ে সে সামনে আগাইয়া আসিল, বলিল, আমি।

—আপনি! প্রফুল্ল হাতের লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিল; তারপর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অন্ধকারে ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন?

নীলিমা মৃদুস্বরে বলিল, কিছু না। সেজদিকে খুঁজতে এসেছিলাম।

—সেজদি! আপনার সেজদি তো কোনোদিন এদিকে আসে না।

—না, না, তা নয়। তবে বাড়ীতে এখন কেউ নেই কি-না! মা ওপাড়ায় গেছেন, বাবা বাইরে, চাকরগুলোও এদিকে-ওদিকে। তাই ভয় করছিল। তা ঘরটা আপনি এর মধ্যেই বেশ সাজিয়েছেন তো!

নীলিমা জানিত, শুক্লা রোজকার মতো এখন চিঠি লিখিতে বসিয়াছে—সহজে নীচে নামিবে না। সে প্রফুল্লের বিছানাটার একপাশে বসিয়া পড়িল।

—বাঃ, ও জানলাটা ওই রকম খুলেই রাখেন নাকি! ঠাণ্ডা লাগবে যে।

কিন্তু মনের দিক হইতে প্রফুল্ল অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিল। এই একটি মাসের মধ্যেই সে পরিমণ্ডলটা বুঝিয়াছে—বেশ ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে। নীলিমার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা করিবার একটা অসঙ্গত চেষ্টাও যে এর ভিতরেই লক্ষ্য করিতে পারে নাই, তা নয়। কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতা যে ক্ষেত্র বিশেষে কতদূর বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে, এখন সে বেশ উপলব্ধি করিল। নির্জন ঘর,—সন্ধ্যার অন্ধকার এবং ঘরে তাহারা দুইজন,—কাহারো চোখে পড়িলে ব্যাখ্যাটা মুখরোচক হইবে না; অন্যের পক্ষে হইতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে নয়।

প্রফুল্ল হাসিবার ভঙ্গিতে সামনের ঝকঝকে দাঁত কয়টা বাহির করিয়া বলিল, না, রাত্তিরে বন্ধ করেই দিই।

—রাত্তিরে আবার কেন, এখুনি দিন না—। ওপাশে যা একটা

ডোবা আছে, দারুণ মশা সেখানে। সন্ধ্যে হলেই ভন্ ভন্ করে ঘরে এসে ঢোকে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

প্রফুল্ল এমন বিপন্ন বোধ করিল যে, বলার নয়।

—কিন্তু এখন একটু মাপ করতে হবে যে আমাকে। বিশেষ কাজ রয়েছে খানিকটা, আপনার সঙ্গে কথাবার্তা তো বলতে পারব না।

—কাজ করুন না আপনি। ওপরে কেউ নেই, ভারী ভয় করছে আমার। আপনার হাতের লেখা খুব সুন্দর কিন্তু। আপনি যখন চুপ করে বসে লেখেন, তখন দেখতে আমার বেশ লাগে।

প্রফুল্লের বিরক্তি বাড়িতে লাগিল। নীলিমা কী মনে করিয়াছে, কে জানে, হয়তো এ তাহার ছেলেমানুষী খেয়াল। আর ছেলে মানুষ ছাড়া নীলিমাকে প্রফুল্ল কী-ই বা মনে করিতে পারে! কিন্তু এ ছেলেমানুষীকে তো এখন প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। পরের বাড়ীতে যেখানে আশ্রয়, সেখানে এ সব ব্যাপারে লোকনিন্দাকে ভয় করিতে হয়।

অতএব ভদ্রতা-বোধকে একটু খর্ব করিয়াই সে স্পষ্টভাবে কহিল, কিন্তু এ সময় এখান থেকে আপনার যাওয়াই ভালো। লোকে, মানে ইয়ে, লোকে একটা কিছু মনে করতে পারে তো?

নীলিমার শ্যামল মুখে লজ্জার একটা ছায়া পড়িল, কিন্তু সে নাছোড়-বান্দা; বলিল কেউ এখন আসবে না এদিকে। কিন্তু লোকে কী মনে করতে পারে, বলুন না?

প্রফুল্লের দৃষ্টি কঠোর হইয়া আসিল। নীলিমা ছেলে মানুষ নয়। তাহার কথার মধ্যে যে অস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত আছে, সেটা যেন পরিস্ফুট হইয়া আসিতে লাগিল।

নীলিমা লজ্জা-জড়িত স্বরে বলিল, লোকে যাই-ই মনে করুক আপনাকে আমার ভারী ভালো লাগে, সত্যি বলছি খুব ভালো লাগে!

প্রফুল্লের সর্বাঙ্গ কাঠ হইয়া গেল। এ যে প্রণয় নিবেদন! নীলিমা ভাষা শেখে নাই; তাই এত সহজে, এমন সুলভভাবে নিজেকে প্রকাশ করিয়া বসিল। কিন্তু একি মুস্কিল বাধিয়া বসিল আবার! নীলিমার এ প্রেম সে গ্রহণ করিবে কি, এতটুকু মেয়ের মুখে এমন কথা শুনিবার আশাই তো সে করে নাই। তা ছাড়া প্রেম করিবে—এমন সুলভ এবং অপর্যাপ্ত সময়ই বা তাহার কোথায়?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া প্রফুল্ল কয়েক পা সরিয়া গেল। কহিল, ছেলে-মানুষী করবেন না এখন। আপনি যা বলছেন, তার মানে যে আপনি বোঝেন না, তা নয়! ওসব কথা শোনা আমার যেমন অন্যায়, আপনার পক্ষে বলাও তার চাইতে কম অন্যায় নয়। আর দেখছেন তো, হাতে বিস্তর কাজ আমার, এ নিয়ে বিলাসিতা করবার মতো অবকাশ আমার নেই।

নীলিমা চুপ করিয়া রহিল। আজ তাহার মনে একি তীব্র মাদকতা আসিয়াছিল—এমন নগ্ন, নিবারণভাবে সে নিজেকে প্রফুল্লের কাছে প্রকাশিত করিয়া বসিল! এবং শুধু প্রকাশিতই নয়, সে ইহার বিনিময়ে লাভ করিল আঘাত, লাভ করিল প্রত্যাখ্যান! বয়স তাহার যাই-ই হোক গ্রামের অমার্জিত পরিস্থিতির মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়া সে অত্যন্ত অসময়েই এ সমস্ত ব্যাপারে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, বয়োধর্ম তো আছেই। তাই প্রফুল্লের কাছ হইতে এই অতি স্পষ্ট আঘাতটা পাইয়া সে কয়েক মুহূর্ত বেদনায় বিমূঢ় হইয়া রহিল।

কিন্তু নীলিমার যে আজ কী হইয়াছে, ইহাতেও সে ফিরিতে পারিল না। তাহার ঘাড়ে যেন ভূত চাপিয়াছিল। বলিল, কী আপনার এত

কাজ? সে কাজ কি এতই বেশি যে আপনি দিনরাত তাই নিয়ে থাকবেন? ঐ তো ইস্কুল, ছেলে পড়ানো—

—ভুল করেছেন আপনি। ছেলে পড়ানোটা আমার কাজের উপলক্ষ মাত্র—শেষ লক্ষ্য নয়। যেদিন আমার কাজ শেষ হবে, সেদিনই ঘর-সংসারের যা কিছু স্নেহ ভালবাসার বন্ধনকে আমি মেনে নিতে পারব, তার আগে নয়।

—সে কাজ কবে আপনার শেষ হবে?

—কবে? প্রফুল্ল তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না, টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া নীলিমার দিকে ফিরিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। তারপর উজ্জ্বল চোখ দুইটি নীলিমার আনত ম্লান মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া ধরিল। নিরুত্তাপ, প্রশান্ত কণ্ঠ, কিন্তু পাষাণের মতো কঠিন একটা দৃঢ় নিশ্চয়তা তাহার সে কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইল:

—যেদিন আমার দেশকে, আমার পৃথিবীকে আমি এই অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারব, যেদিন যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিতে পারব। তার আগ পর্যন্ত আমার জন্যে ঘর নেই, বিশ্রাম নেই, প্রেম নেই। অনেক ভুলে আমাদের পৃথিবী ভরে উঠেছে; ভয়ে আর অত্যাচারে, ক্ষুধায় আর অপচয়ে, লোভে আর দুর্ভিক্ষে! এই পৃথিবীটাকে রসাতলে পাঠিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত আর এক পৃথিবী গড়ে তুলতে না পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি থামতে পারব না—আমার থামা অসম্ভব। The war is waged and I am a soldier!

শুধু ঘরেই নয়, নীলিমার সারা মস্তিষ্কের মধ্য দিয়াই প্রফুল্লের কঠোর নিষ্ঠুর কথাগুলি গন্ গম্ করিয়া বাজিতে লাগিল। তাহার সমস্ত স্নায়ুকোষের অভ্যন্তরেই যেন সেগুলি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল!

নীতিমা আড়ষ্টের মতো শুধু কহিল, আর এক পৃথিবী!

—হাঁ, আর এক পৃথিবী! প্রফুল্ল একটানে টেবিলের ড্রয়ারটা খুলিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্য হইতে কী একখানা বই বাহির করিয়া আনিল। কহিল: বর্তমান পৃথিবীর রূপ কী দাঁড়িয়েছে, নিজের চোখে সব সময় তা হয়তো দেখতে পান না। যদি পেতেন, তা হলে দেখতেন, চারদিকে কী সাংঘাতিক মৃত্যুর ছায়া! সে ছায়া আপনাদের এই গ্রামের ওপরেও তিলে তিলে নেমে আসছে, সর্বনাশের বন্যায় বিশ্ব-সংসার ভেসে যাওয়ার উপক্রম করছে। হাজার হাজার বছরের জমাট অন্ধকার এখানে পাথরের মতো অনড় হয়ে রাজত্ব করছে। আর এই অন্ধকারের মধ্যে বাস করতে করতে আজ আমরা অক্ষম, আজ আমরা অন্ধ। তাই বাইরের আলোক এনে আমাদের দেখতে হবে, কী ভাবে চলেছে আমাদের ওপর দস্যুতা, কোথায় মাটির আড়াল থেকে মৃত্যু-বীজ ফুলে ফসলে বড় হয়ে উঠেছে!

বইখানা সে নীলিমার দিকে বাড়াইয়া দিল: পড়তে চেষ্টা করুন, সবটা যদি বুঝতে না-ও পারেন অনেকটাই পারবেন। এবং তারপরে—

প্রফুল্ল হাসিয়া ফেলিল, তারপরে যদি আমাকে গুণ্ডা বলে মনে না হয় এবং আমি যা করতে যাচ্ছি, তা আগুন নিয়ে খেলা, এ বিশ্বাস আপনার মনে দৃঢ় না হয়, তা হ'লে আপনি যা দিতে চেয়েছেন, তা আমি প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করব।

নীলিমা হাত পাতিয়া বই লইল বটে, কিন্তু একটা অর্থহীন ভয়ে এবং উত্তেজনায় সমস্ত দেহ তখন তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। কথাগুলার সবটা সে বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার মতো শিক্ষাও তাহার নাই। তবু কিসের একটা অশুভ অনুমানে তাহার সমস্ত বৃত্তিগুলি যেন আসিতেছে আশঙ্কায় অসাড় হইয়া।

প্রফুল্ল স্মিত মুখেই কহিল, আর এখানে দেরী করছেন কেন ? রাত অনেক হয়ে গেল কিন্তু। কেউ এসে পড়তে পারে আবার।

নীলিমা এক রকম অচেতন পা ফেলিয়াই নিজের ঘরে চলিয়া আসিল, তারপর বইখানাকে বুকের নীচে চাপিয়া ধরিয়া অন্ধকারে বিছানার উপরে উবুড় হইয়া পড়িল। চোখ দিয়া অকারণে তাহার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।···জীবন যেন প্রসারিত একটা অন্ধকার রহস্যলোক, পদে পদে তাহার অপরিচিত বিচিত্র বিস্ময়! সেই বিস্ময়ের জগতে নীলিমার এই প্রথম পদার্পণ।···

নীচের ঘরে একখানা জরুরি চিঠি লিখিতে গিয়া সৈনিক প্রফুল্ল অন্যমনস্ক হইয়া গেল, চেয়ার ছাড়িয়া জানলার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল সে। অন্ধকারে কোথায় হাস্‌নাহানা ফুটিয়াছে, বাড়ীর দো-তলাতে কে যেন সেতার বাজাইতেছে, বাহিরের বনকুঞ্জ রাত্রির বাতাসে যেন স্বপ্ন-মর্মরিত হইতেছে। এই মুহূর্তটি বিচিত্র,—এমন একটি মুহূর্তে জীবনের সব চাইতে বড় কর্তব্যকেও হয়তো ভুলিয়া যাওয়া চলে।

কিন্তু এ শুধু ক্ষণিকের জন্য! কামানের অগ্নি-শিখায় যেখানে আকাশ আজ আলো হইয়া গেল, মৃত্যু-ঈগলের ধাতব পাখায় যেখানে নিখিল কল্যাণের মারণ-মন্ত্র বাজিতেছে, সে রক্ত-পঙ্কিল রণক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া কে আজ নীড়ের দিকে ফিরিয়া তাকাইবে ?

প্রফুল্লের মনের মধ্যে বার বার ছন্দিত হইতে লাগিল :

"এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি,
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্র হেন ভারী,
এ যে তোমার তরবারি।"

তিমির-তীর্থ

সাহেবপুর চরে হাট বসিয়াছিল। এ অঞ্চলে একমাত্র নলসিঁড়ি ছাড়া এত বড় হাট আর নাই বলিলেই চলে। তা নলসিঁড়ির হাট—সে-ও এখান হইতে পুরাপুরি দুই মাইলের কম হইবে না নিশ্চয়। ইতিমধ্যে আশে-পাশে আরো যে কয়খানা গ্রাম এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছড়ানো রহিয়াছে, সপ্তাহে একটি দিন—ওই হাটটির অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিলে তাদের চলে না। গ্রামের এই সব সাধারণ অধিবাসীদের হাটই একরকম প্রাণ বলা যায়। ধরো, নদীর বিশাল বিস্তারের মধ্যে দুর্গম চরে যাহারা একটুখানি বসতি গাড়িয়া বসিয়াছে, শিক্ষা-সভ্যতার বাহিরে লাঙল ঠেলিয়া কিংবা বাথানের মহিষ চরাইয়া যাহাদের দিন গুজরাণ করিতে হয়, সাপ্তাহিক প্রয়োজনের জিনিষ-পত্র সংগ্রহ করিতে তাহাদের এই-ই একটি মাত্র অবলম্বন।

আর শুধু সাংসারিক দিক হইতেও নয়; মানুষ যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক, প্রয়োজনের বাহিরে বিলাসিতা বলিয়া আর একটি যে দুর্মূল্য বস্তু আছে, তাহার প্রতি আকর্ষণ তাহাদের প্রচুর। মোটর লইয়া বিলাতী দোকানে সৌখিন জিনিষ-পত্র কেনার মধ্যে যে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা রহিয়াছে, একখানা রঙচঙে তাঁতের কাপড়, দুই ছড়া রঙীন পুঁতির মালা অথবা কয়েক গাছা কাঁচের চুড়ি কেনার মধ্যেও তাহার চাইতে কম উৎসাহ-উদ্দীপনা নাই।

সুতরাং জাঁকাইয়া হাট বসিয়াছে। দশ মাইল, বারো মাইল দূরের পথ হইতে মানুষ আসিয়াছে দোকান লইয়া, আসিয়াছে হাট করিতে। ঠিক আড়িয়ল খাঁ হইতে বাহির হইয়া যে কাটা-খালটি সোজা নলসিঁড়ির দিকে বাহিয়া গিয়াছে, সে খালটি ডিঙি-নৌকার ভিড়ে প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। এ সমস্ত নৌকাও আসিয়াছে নানা বিচিত্র জাতের—নানা দিক-দেশ হইতে নানাধরণের মানুষ লইয়া; তালের ডিঙি হইতে আরম্ভ করিয়া গয়নার নৌকা অবধি বাদ নাই। আট দশখানি বড় বড় নৌকা আসিয়া খালের মুখে নোঙর ফেলিয়াছে, মাঝিরা হিন্দুস্থানী। এই নৌকাতে করিয়াই বরিশালের সুবিখ্যাত বালাম চাউল চালান যায়। আর একরকম লম্বাটে ধরণের বড় বড় নৌকা— ইহারা অন্যান্যগুলি হইতে একটু দূরে স্বতন্ত্র ভাবে যেন নিজেদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া সরিয়া আছে। ইহারা "বেবাজিয়া"দের নৌকা।

"বেবাজিয়া"—অর্থাৎ বেদে সম্প্রদায়; এ অঞ্চলে এই নামেই ইহারা পরিচিত। জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ অর্থে যে যৌন-লিপ্সার চরিতার্থতা, তাহারা ইহাদের এই নৌকার সঙ্গেই অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। নামত ইহারা মুসলমান, কিন্তু আচার অনুষ্ঠানে কোনো ধর্মের দাসত্বই স্বীকার করেনা। জীবনের প্রথম দিনটি হইতে শেষদিন পর্যন্ত পৃথিবীর ঘাটে-ঘাটে ভাসিয়া বেড়ায়। নদীতে মাছ ধরে, মদ খায় এবং গৃহস্থ পল্লীতে ভানুমতীর খেল্ দেখায় আর টোট্‌কা-টাটকা ওষুধ বিক্রি করিয়া ফেরে। স্ত্রীলোকেরা গলুইয়ে দাঁড়াইয়া পুরুষের মতো মাল্‌কোঁচা আঁটিয়া নৌকা বায়, খেলো হুঁকায় করিয়া তামাক টানে। একদল বলিষ্ঠ কুকুর সঙ্গে থাকে, ডাঙ্গায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়, অবসর সময় গলুইয়ে বসিয়া জল দেখিতে দেখিতে ঝিমাইতে থাকে।

হাটের ধারেই কালীপদ পোদ্দারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশী মদের

দোকান। কয়েক বছর আগেও এই দোকানের মুনাফা হইতে কালীপদ লাল হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই যে কুক্ষণে স্বদেশীর হুজুগ সুরু হইল, শনির দশা ধরিল কালীপদের। যেখানে মাসে দু'শো গ্যালন মদ কাটিত, সেখানে কাটিতে লাগিল পনেরো কুড়ি গ্যালন। সে হুজুগ মিটিল তো সুরু হইল মানুষের অকাল। ধবক্ করিয়া পাটের বাজারটা নামিয়া গেল। রাতারাতি পয়সা-কড়িগুলা কোথায় গিয়া যে হাত পা গুটাইয়া গ্যাঁট হইয়া বসিল, তা একমাত্র বিধাতাই বলিতে পারেন।

তা যাই হোক, ভগবানের আশীর্বাদে দিনকালের আবহাওয়া এক-একটু করিয়া বদলাইতে সুরু করিয়াছে যেন। মদ আজকাল কিছু বেশিই বিক্রী হইতেছে। এই 'বেবাক্কিয়ারা'ই কালীপদের বড় বড় মূল্যবান্ খরিদ্দার। ইচ্ছা করিলে চাই কি, এক-একজনেই একসঙ্গে বসিয়া সাত আটটি পচাত্তরের বোতল তলানি শুদ্ধ নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে।

হাটবারই লক্ষ্মীবার—কালীপদের দোকানের সামনে একটা ছোটখাট ভিড় জমিয়া গিয়াছে। কাঠের কাউন্টারের সামনে দাঁড়াইয়া বোতল সরবরাহ করিতেছে কালীপদ। একপাশে মাটির প্রদীপের আকারে কতগুলি ছোট ছোট পান-পাত্র—বোতলের সঙ্গে এগুলি বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

সম্প্রতি দোকানের সামনে নমঃশূদ্র শ্রেণীর একদল লোক জাঁকাইয়া বসিয়া ছিল। আশে-পাশে তাহাদের পাঁচ-সাতটা পচাত্তর ও ষাটের বোতল গড়াগড়ি যাইতেছে। একরাশ মাটির পাত্র এদিক-ওদিক ছড়াইয়া, একটা বড় শাল পাতার ঠোঙায় প্রচুর ছোলা আর কাবলী মটরভাজা, কয়েকটা প্যাঁজ-ফুলুরী এবং বেগুনী। এগুলি মদের চাট হিসাবে ব্যবহৃত হইতে ছিল।

ইহাদের দলপতি মানিক ভুঁইমালী—কাপ্তেনও বলা চলে। অবস্থা

তাহার শীতের সময়ে সকলের চাইতে সচ্ছল থাকে। খেজুর গাছ চাঁছিতে তাহার কৃতিত্ব এ অঞ্চলে স্বীকৃত; দৈনিক প্রায় দেড়শো গাছ হইতে সে হাঁড়ি নামায় এবং আধি বখরার দরুণ যথেষ্ট পরিমাণে রসও পাইয়া থাকে। এই হেতু শীতের মরশুম ভরিয়া তাহার চতুর্দিকে প্রসাদার্থীদের চমৎকার একটি ভিড় থাকিয়া যায়।

পূর্ণ পাত্রটা এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া মাণিক একটা আস্ত বেগুনী মুখে পুরিয়া দিল। আকণ্ঠ মদ উদরস্থ করিয়াও তাহার নেশা জমে নাই। দুই তিনটা বোতল নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, ফুরিয়েছে?

একজন বলিল, ফুরোবে না? যে টান ধরেছে তাতে মদ তো মদ চোঁ চোঁ শব্দে স্বয়ং ভাগীরথী অবধি শুকনো মেরে যেতেন বাবা!

এক থাবা কাবলী মটর চিবাইতে চিবাইতে আর একজন প্রশ্ন করিল, ভাগীরথী! সে আবার কি হে পণ্ডিত?

বোঝা গেল, আগের লোকটির নাম পণ্ডিত। এটা তাহার আসল নাম নয়, সম্ভবত তাহার বিশ্রুত পাণ্ডিত্য অথবা পাঠশালার পণ্ডিতগিরি হইতে সে এই সম্মানজনক উপাধিটি পাইয়াছে। পণ্ডিত পণ্ডিতের মতোই হাসিয়া কহিল, ভাগীরথী জানো না তো জানো কচুপোড়া? ভাগীরথী হলেন গিয়ে স্বয়ং মা গঙ্গে; সেই 'গঙ্গে চ যমুনে চ' আর কি। মায়ের সহস্র নাম, গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী, মায় আমাদের আড়িয়ল খাঁ পর্যন্ত!

—বল কি! কাবলীমটর চর্বণকারী লোকটি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল: মা গঙ্গে, সামনে মা গঙ্গে! এই ভরসন্ধ্যে বেলা—জয় মা—

এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে স্খলিত পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইল, ভাবটা যেন গঙ্গায় সে ঝাঁপ মারিবে, কিন্তু ঝাঁপ সে মারিল না। হাত দু'খানা বাড়াইয়া, পিঠ বাঁকাইয়া বার কয়েক সে সামনের দিকে দোল খাইল, তারপর

কথা নাই, বার্তা নাই, মুখ থুবড়িয়া সোজা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল।

পড়িল একেবারে মোক্ষম পড়া। অন্য সময় হইলে নাক মুখ থেঁতলাইয়া যাইত নিশ্চয়; কিন্তু নেশা-প্রসাদাৎ আপাতত সে কোনো রকম বেদনা বোধ করিল বলিয়া মনে হইল না। বরং পরম নিশ্চিন্তে তাহার নাম হইতে এক রকম শব্দ বাহির হইতে লাগিল, যেটাকে অনায়াসে নাসা-গর্জন বলিয়া ভ্রম করা চলে।

পণ্ডিত কাঁদিয়া ফেলিল, সহসা কিসের একটা ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণায় তাহার সমস্ত অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। গদগদ কণ্ঠে কহিল, আহা হা, ভর হয়েছে রে, মায়ের ভর! ক্যাবলাটা ভাগ্যবান্ পুরুষ, বাপের পুণ্যে আর কিছুদিন বাঁচলে হয়!

—পাঁড় মাতাল হয়ে উঠেছে এগুলো—সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া মানিক নিঃশেষিত বোতল কয়টি তুলিয়া লইয়া কাউন্টারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার পা এখনো টলে নাই। আরেকটা তিরিশের বোতল টানিতে পারিলে তবে নেশাটা তাহার জমিবে।

কাউন্টারের সামনে বোতলগুলি জমা দিয়া সে প্রশ্ন করিল: আর আমার কত পাওনা রইল বাবু? মদ খাইবার আগেই দশটাকার একখানা নোট সে জমা রাখিয়াছে, নেশার ঝোঁকে পাছে খেয়াল না থাকে, ট্যাঁকের অতিরিক্ত খরচ করিয়া বসে সেইজন্য। কালীপদ নিকেলের চশমার ভিতর হইতে প্যাঁচার মতো তীক্ষ্ণ ক্রূর চোখ মেলিয়া তাহার দিকে তাকাইল। খালি গা, মসীকৃষ্ণ ভুঁড়িটি প্রধান লক্ষ্যণীয়। মনে মনে কী একটা হিসাব করিয়া কহিল, একটাকা সাত আনা।

বিস্মিত স্বরে মাণিক বলিল, মোটে? এখনো তো নেশাটা ভালো ধরলো না পোদ্দার মশাই, এর মধ্যেই—

সোজা ঝাঁকিয়া উঠিয়া কালীপদ কহিল, তবে আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি? আমি চোর? ব্যাটা মাতাল, মদ টানতে পারবি আর হিসেব রাখতে পারবিনে?

অতবড় ষাঁড়ের মত জোয়ানটা! ধমক খাইয়া একেবারে কেঁচোটি হইয়া গেল।

—না, না, তা কী আর বলছিলাম কর্তা। আপনাকে চোর বলতে এতখানি বুকের পাটা আছে আমাদের? তবে এখনো 'ঝুম্' লাগলনা কি না, তাই—

—'ঝুম্' লাগলনা তো আর একটা তিরিশের বোতল নিয়ে যা। আসচে হাটে এক আনা পয়সা দিয়ে যাস্।

—তাই আজ্ঞে,—মাথা নীচু করিয়া আর একটা বোতল নিয়া মাণিক সরিয়া পড়িল। কয়েক পা আগাইয়াই অস্ফুট স্বরে শপথ করিয়া বলিল, নাঃ ছেড়েই দোব শালার পাজী নেশা! ঘরের টাকাগুলো হারামজাদা পোদ্দারকে খাইয়ে—

কিন্তু প্রত্যেক হাটবারেই শূন্য-ট্যাঁক হইয়া এই প্রতিজ্ঞাটা সে করিয়া থাকে এবং পরের হাটেই প্রতিজ্ঞা তাহার ভুল হইয়া যায়। মদের দোকানটা চোখে পড়িবামাত্র একটা অসহ্য তীক্ষ্ণ তৃষ্ণায় তাহার গলার শিরা-নালীগুলি মরুভূমির মতো জ্বলিতে থাকে, দেশী মদের মহুয়া-পচা মাতাল-করা গন্ধে এবং অ্যাল্‌কহলের তীব্র আস্বাদ-স্মৃতিতে অন্তর উদ্বেল হইয়া ওঠে; এবং পরক্ষণেই—

কালীপদ সাপের মতো দুইটি ছোট ছোট নিষ্পলক চোখে মাণিকের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চাহিয়া রহিল। বিক্রির মুনাফা ছাড়িয়াও মত্ততার সুযোগ লইয়া নগদ আড়াইটা টাকা লাভ। বিবেক মধ্যে মধ্যে তাড়া দেয় বটে, কিন্তু মাতালের ধন তো বারো ভূতেই লুটিয়া খাইবে। সে-ও

না হয় সে রাশীকৃত অপব্যয়ের মধ্য হইতে কিছু ভাগ বসাইয়া লইল। ছাঁ-পোষা মানুষ, পাপ অর্শিবেনা নিশ্চয়ই।

হৈ-হৈ করিতে করিতে বেবাজিয়ার দল আসিয়া পড়িল। হাঁ,—খদ্দের বলিতে হয় তো ইহাদের, মাণিকের মতো কাপ্তেন ছোট জাতের মধ্যে দু'চার জন মাত্র আছে, কিন্তু 'বেবাজিয়া'রা প্রত্যেকেই এক একজন কাপ্তেন; এক নাগাড়ে সাত আট বোতল মদ চোখ বুজিয়া হজম করিতে পারে। তবে দুঃখ এই যে, ইহারা কোথাও বেশিদিন ডেরা বাঁধিয়া থাকিতে পারে না, জীবনের ঘাটে ঘাটে এলোমেলো ভাবে ভাসিয়া বেড়ানোকেই ইহারা সত্য বলিয়া জানিয়াছে।

যে দলটি আসিল, স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া সংখ্যায় তাহারা প্রায় পনের জন হইবে। বেশ-বাস এবং চাল-চলনে তাহারা যে অন্যান্যদের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এক্ষেত্রেও তাহার পরিচয় মিলিল। দোকানের ভিড় এবং হাটের জনতার দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইল না তাহারা। এক গাদা বোতল লইয়া একপাশে চক্র করিয়া বসিল এবং বলিষ্ঠ-দেহা দীর্ঘাকৃতি একটি মেয়ে সকলকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল। এসব ব্যাপারে মেয়েদের একচেটিয়া অধিকারকে এক্ষেত্রেও সে ক্ষুণ্ণ করিতে রাজী নয়।

সঙ্গে আবার তাহাদের মোটা মোটা গোটাকতক কুকুরও আসিয়াছে, এগুলি তাহাদের নিত্য সহচর। চর্বিযুক্ত তৈলাক্ত দেহ, গায়ের লোমগুলি যেন চক্ চক্ করিয়া জলে। পায়ের পেশীগুলি পরিপুষ্ট, ঝাঁকড়া চুলের আড়াল হইতে তাহাদের বন্য চোখগুলি দীপ্তি পায়। বেদেনী মেয়েটি মাটির পাত্রে খানিকটা করিয়া মদ ইহাদের ঢালিয়া দিল। জীবনের ছোট বড় নানা সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দের সঙ্গে নেশারও অংশীদার ইহারা।

নেশা জমিতে লাগিল এবং হল্লাও তাহারি সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিল।

মনাবতার শ্রীক্ষেত্র বলিতে হয়তো ইহাকেই। অনভ্যস্ত চোখে জিনিষ-টাকে যত অপ্রীতিকরই মনে হোক, ইহাদের জীবনের আনন্দ-উৎসবের অঙ্গ হইতে এটাকে কোনোমতেই বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া চলে না। বহু দূরের শিক্ষা সভ্যতা বিবর্জিত গ্রামে, নোনা জলের নিভৃত আশ্রয়ে চরের মধ্যে যাহারা বাস করে, সপ্তাহের মধ্যে এই একটি দিনবিশেষের জন্ম তাহারা যেন তৃষ্ণার্ত হইয়া থাকে, এবং সে বিকৃত আনন্দ-তৃষ্ণা এই মদের দোকানের সামনে আসিয়াই উদ্দাম হইয়া ওঠে।

তবে এইটুকু নিষ্কৃতি যে, এখানে রূপোপজীবিনীদের ভিড় নাই। থাকিলে অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ হইত—অন্তত কালীপদ সে কথা ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মদ অন্তত কোন্ না আরো দু চার গ্যালন বেশি বিক্রি হইত। তা ইহাদের অনেকের মধ্যে বিবাহ বন্ধনটাই যখন সত্য নয় এবং পারিবারিক নিষিদ্ধ গণ্ডিটাকেও যখন সকলে মানিয়া চলেনা তখন এখানে দেহ-বিক্রয়ের ব্যবসা করিয়াও খুব লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

তিন চারজন লোক লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, 'বেবাজিয়া'দের একটা কুকুর তাহাদের মুখ চাটিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু কুকুরটাকে তাড়াইবার চেষ্টা কেউ করিতেছে না। মত্ততার আদিমতম পর্যায়ে আসিয়া কুকুর ও মানুষ নিঃসংশয়ে এক হইয়া গিয়াছে। একজন অশ্লীল অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া অশ্লীলতর একটা গান জুড়িয়াছে এবং আর একজন অশ্লীলতম ভঙ্গিতে খেমটা জাতীয় একটা নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে।

চাদরে ঢাকিয়া তিনটা ধাটের বোতল লইয়া রসময় চলিয়া গেল। সম্প্রতি কাঁচি হইতে সে প্রোমোশন পাইয়াছে। মুকুন্দ আসিয়া এক সিকি গাঁজা কিনিল। প্রতি হাটবার সন্ধ্যায় সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করিয়া সে জন-কতক বন্ধু বান্ধব লইয়া সিদ্ধি এবং গাঁজার সেবা করিয়া

থাকে। গত বৎসর এক মন্ত্রসিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া সে এই নূতন অভ্যাসটি গড়িয়া তুলিয়াছে। গাঁজায় একটা ব্রহ্মদম লাগাইয়া যদি পাঁচটি মিনিট ভোঁ হইয়া বসিয়া থাকা যায়, তাহা হইলে সুষুম্না নাড়ীতে সুড়-সুড়ি লাগিয়া কূল-কুণ্ডলিনী লাফাইয়া উঠিবেন এবং মূলাধার-চক্রে সাক্ষাৎ দেবী ধূমাবতীর আবির্ভাব ঘটিবে, ইহা সাধকদের পরীক্ষিত সত্য।

কাউণ্টারের উপর কতকগুলি নূতন বোতল সাজাইতে সাজাইতে কালীপদ শুনিল, পিছনের দরজায় অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে টক্ টক্ করিয়া টোকা পড়িতেছে।

এখানে কাউণ্টারটির একটু বর্ণনা প্রয়োজন। কালীপদ মদ এবং গাঁজার জয়েণ্ট লাইসেন্সী, পাশাপাশি দুইটি জানালা হইতে মদ ও গাঁজা সরবরাহ করা হইয়া থাকে। ঘরের মধ্যে দুইটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কেরোসিন কাঠের বাক্স আলমারীর মতো করিয়া রাখা, তাহার একটা দিক কাটা; মাঝখানে দুই তিনটা তাক করা। এই তাকগুলিতে মদের বোতল, গাঁজার মোড়ক এবং মাপিবার পিতলের নিক্তি প্রভৃতি সাজানো। আসলে জানালার পিছনে এই বাক্স দুইটিই কাউণ্টারের কাজ করিতেছে।

দোকানে বাজে লোক ঢুকিবার নিয়ম নাই বলিয়া কাউণ্টারের সামনের দিকে কোনো দরজার ব্যবস্থা নাই; কিন্তু বাজে লোক ঢুকিবার নিয়ম থাক বা না থাক, ঘরের মধ্যে সযত্নে একখানা বেঞ্চি পাতা রহিয়াছে। প্রকাশ্য না হোক, এটির অপ্রকাশ্য একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। বাড়ীতে বোতল বহিয়া লইয়া যাওয়া যাদের সম্ভব নয়, ডুবিয়া-জল খাওয়া সেই জাতীয় ভদ্রলোকদের এবং হাটে তদারক বা তদন্ত করিবার জন্য যে সমস্ত পুলিশ ও জমিদার কর্মচারীর আবির্ভাব ঘটিয়া

থাকে, এটা তাঁহাদেরই কাহারও কাহারও গলা ভিজাইবার নিভৃত স্থান। পিছনের দরজায় টোকা পড়িবারও বিশেষ একটা অর্থ আছে।

গাঁজার বাক্স সামনে লইয়া যে ছোকরা ভেণ্ডারটি খদ্দেরদের পুরিয়া সরবরাহ করিতেছিল, শশব্যস্তে উঠিয়া দরজাটা সেই খুলিয়া দিল।

ঘরে ঢুকিলেন অবসরপ্রাপ্ত দারোগা রামকমল চাটুয্যে এবং বার্ষিক দু'হাজার টাকা মুনাফার জমিদার গণু মিঞা স্বয়ং। বাহিরের পরিবেশের মধ্যে দেখিলে বোঝা যায় না,—সাধারণ আর দশজনের সঙ্গে মিশিয়া রামকমল এক হইয়া যান। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চামড়া ঝুলিয়া-ইঁদুরের মতো মুখ এবং একটা চোখের ঈষৎ ট্যারা দৃষ্টি তাঁহার চরিত্রের একটা অপ্রীতিকর বিশেষত্বের প্রতি নির্দেশ করে শুধু; কিন্তু এই মদের দোকানে এক গ্লাস ত্রিশ হাতে লইয়া না বসিলে তাঁহাকে যেন সম্পূর্ণ চেনা যায় না। বিনা পয়সার মদ ব্রাহ্মণেও খাইয়া থাকে, দারোগা-জীবনে এই আর্যবাক্যটি প্রমাণ করিবার সুযোগ রামকমলের ঘটিয়াছিল; কিন্তু ওই বস্তুটার বিশেষত্বই এই যে, দেখিতে দেখিতে সুযোগটি নেশায় পরিবর্তিত হইয়া গেল। দীক্ষাদাতারা তো গাছে তুলিয়া দিয়া মই লইয়া সরিয়া পড়িলেন, এদিকে গাঁটের কড়ি বাহির করিয়া নেশার সেবা করিতে রামকমলের প্রাণান্ত।

প্রেসিডেন্ট গণু মিঞার চেহারায় একধরণের আভিজাত্য আছে। শরীরে মেদ-বাহুল্য, গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা, বুদ্ধিহীন চোখ দুইটা অশোভন রকমে নির্বাপিত, নাকের উপর গোটা তিনেক রক্তাক্ত শিরা নজরে পড়ে, মদ্য মাংসের অকুণ্ঠচর্চায় লোকটির ব্লাড্-প্রেশার বাড়িয়াছে। নেশার ব্যাপারে ইহারা দুইজনে মানিক জোড়।

ছোকরা ভেণ্ডারটি অতি সাবধানে আবার পেছনের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল। কর্কস্ক্রু দিয়া খুলিয়া এক বোতল খাঁটি এবং দুইটা

কাঁচের গ্লাস আগাইয়া দিল কালীপদ। গ্লাস দুটিও ইহাদের মতো বিশিষ্ট ব্যাক্তিদের জন্য রিজার্ভ থাকে।

পান চলিতে লাগিল এবং দুই গ্লাসের পর তিন গ্লাস নামিতেই রামকমলের বয়োশুষ্ক দেহ যেন আনন্দে উদ্দীপনায় সতেজ হইয়া উঠিল।

গণু মিঞা বলিতেছিলেন: মেলাটা জমছেনা, এবার যাত্রা গানের বন্দোবস্ত করব নাকি এক পালা?

রামকমল মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া কহিলেন: যাত্রা—ছুয়ো! তার চাইতে ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করলেই তো হয়। ওসব নিরিমিষে এবার চলবে না বাবা, খ্যামটা কিংবা ঢপ-কেত্তনের ব্যবস্থা করো। মাইরি, দারোগা থাকতে জগদলের বাবুদের ওখানে যা একখানা ঢপ-কেত্তন শুনেছিলুম! গৌরাঙ্গিনী খ্যাম্‌টাওয়ালীর সে গান যেন এখনো আমার কাণে লেগে রয়েছে—

বলিয়া তিনি গুন্ গুন্ করিয়া সুরু করিলেন:

"আসিয়া নাগর সম্মুখে দাঁড়াল
গলে পীত বাস লইয়া—
তবু না ক্ষণেকে দেখিলি চাহিয়া
তু বড় কঠিন মাইয়া"—

গণু মিঞা ঠুন ঠুন করিয়া কাঁচের গ্লাসের গায়ে হাতের আংটিটা দিয়া তাল বাজাইতে লাগিলেন।

ভালো করিয়া আর একবার গলা ভিজাইয়া রামকমল কহিলেন: বাস্তবিক, সরকারী চাকরী যখন করতুম, তখন এক চোট ফুর্তি করে নিয়েছি যা হোক। একরকম রাজার হালেই কাটিয়েছি বলা চলে; সে সব দিন আর ফিরে আসবেনা।

গণু মিঞা মদে-রাঙা নির্বোধ চোখ দুইটা বার কয়েক পিট্ পিট্ করিয়া কহিলেন : খুব সুবিধে ছিল বুঝি ?

—ছিলনা আবার ? একদিনের গল্প বলি শোনো : আমি তখন বালুরঘাট মহকুমার এক থানার ইনচার্জ। দুর্গম দেশ, আশে পাশে কেবল ওঁরাও, সাঁওতাল আর ধাওয়া নামে এক সম্প্রদায়ের হরিজন মুসলমানের বসতি। সেদিন খুব বাদলা, সকাল থেকেই অঝোরে বিষ্টি পড়ছিল। থানায় চুপচাপ বসে ডাইরী লিখছি, এমন সময় একদল সাঁওতাল পুরুষ আর একটা জোয়ান মেয়ে এসে হাজির। মেয়েটা কাঁদছে, পুরুষগুলো আস্ফালন করছে—'কেস্‌টা', বুঝতেই তো পারছ কিসের কেস্। ওসব অঞ্চলে এসব হামেশাই চল্‌ছে—একরকম অরাজক মুল্লুক বললেই চলে। কিন্তু আমার সুবিধেই হয়ে গেল। বুঝলুম, ভগবান পাইয়ে দিলেন, বাদলার সন্ধ্যেটি বৃথা যাবে না। বললুম, মেয়েটা আজ থানায় থাকবে, জেরা-টেরা করে ব্যাপারটা ঠিক-ঠাক জেনে নিয়ে রিপোর্ট করব। বোকা সাঁওতালের দল তো, মেয়েটাকে রেখে তখনি সুড় সুড় করে সরে পড়ল। জমাদারকে দিয়ে হাঁড়ি তিনেক তাড়ি আনালুম, কাছাকাছি আবার মদের দোকান নেই। কপাল-গুণে এক ইন্‌স্‌পেক্টার সেদিন এসে পড়েছিলেন, সাক্ষাৎ ঘুঘু লোকটি। ভালো করেই অতিথি-সৎকার করা গেল, আমিও প্রসাদ পেলুম। যাওয়ার আগে ইন্সপেক্‌শন বইতে লিখে গেলেন, এমন যোগ্য সাব ইন্‌স্‌পেক্টর এ জেলায় একটিও নেই।

—আর মেয়েটা ? পরের দিন কিছু বললেনা ?

—নাঃ, স্রেফ চেপে গেল। পুলিশ নয়তো স্বয়ং ভগবান। তার বিপক্ষে কিছু বলতে যাওয়া মানেই নিজেরই মরণ ডেকে আনা কি না !

গণু মিঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন : চমৎকার দেশ! ওসব দেশে থেকেই না আরাম! আর আমাদের এ দেশে লোকগুলো সব পেল্লায় চালাক হয়ে আছে, ধড়িবাজের একশেষ। হারাণ শীলের মেয়েটার দৌলতে সেবার আমার জেলে যাবার জোগাড় হয়েছিল জানো তো?

কিন্তু প্রসঙ্গটা আপাতত এই পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ হইতেই বাহিরে কিসের একটা গোলযোগ চলিতেছিল, সে কলরবটা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মদের দোকানে এরকম চীৎকার, বিশেষত হাটের দিনে—কিছু পরিমাণে হইয়া থাকেই, কিন্তু এটা যেন তাহারও মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। মারামারির উপক্রম একেবারে।

ব্যাপারটা কম হইয়াও কম নয়।

ওদিকে মাণিক ভূঁইমালীর দল, এদিকে বেদে-সম্প্রদায়। মদের ঝোঁকে বেসামাল হইয়া মাণিক একটি বেদেনী মেয়ের কাপড় ধরিয়া টানিয়াছিল, কী একটু ইঙ্গিতও করিয়াছিল হয়তো। কিন্তু বেদেরাও সেই জাতের—জীবনকে যাহারা একটা রঙীন বুদ্বুদের চাইতে বড় বলিয়া মনে করে না। মুহূর্তে 'বেবাজিয়া'র দল গর্জিয়া উঠিল, সেই মেয়েটা কাপড়ের মধ্যে হাত পুরিয়া ঝাঁ করিয়া একটানে ষোলো ইঞ্চি ফলার একখানা ঝক্‌ঝকে ছোরা বাহির করিয়া বসিল! মাণিক ভূঁইমালীর উদ্ধত রসিকতা ছোরা দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া গেল বটে, কিন্তু ভূঁইমালী সম্প্রদায়ের রক্তেও ততক্ষণে আগুন ধরিয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত নামধেয় ব্যক্তিটি মাটিতে একটা লম্বা গড়ান্ দিয়া "জয় কালী" বলিয়া তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল এবং তাহার পরেই বিচিত্র ভঙ্গিতে দুই হাঁটুতে তাল ঠুকিয়া বলিল : চলে আয়, চলে আয় ব্যাটারা। এক একটা মুক্কি কষিয়ে মুখগুলো চ্যাপ্টা বানিয়ে দিই তোদের।

ক্যাব্‌লা—সেই একটু আগেই যাহার স্কন্ধে 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে'র ভর হইয়াছিল, অকস্মাৎ গঙ্গার পরিবর্তে সাক্ষাৎ মহিষ-মর্দ্দিনী তাহার কাঁধে চাপিয়া বসিলেন।

—কে রে ব্যাটা মহিষাসুর! দেখছিস্ না, অসুর নিপাত করতে স্বয়ং মা দুগ্‌গো পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছি! এক একটাকে ধরবো আর কচ্‌ কচ্‌ করে গলা কাটবো।

বেদেরা কিন্তু নেশায় চুর্‌চুরে হইয়া ওঠে নাই, তাহারা লুঙ্গি মালকোঁচা করিয়া আঁটিতে লাগিল। একজন সামনের লোকটির হাতে পাকা একখানা বাঁশের লাঠি আগাইয়া দিল এবং দুই তরফ হইতেই অশ্লীল গালাগালি পর্দায় পর্দায় চড়িতে লাগিল।

জানালা হইতে এইবার গণু মিঞা হুঙ্কার ছাড়িলেন।

—এই হতভাগা মাণ্‌কে, কী সুরু করলি ওখানে?

মাণিক থমকিয়া দাঁড়াইল, গণু মিঞার সে প্রজা। 'দয়া হল না মা কালী' বলিয়া পণ্ডিত ধূলার উপরে আবার একটা গড়ান দিল এবং ক্যাব্‌লা 'বম্‌' বলিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল।

হাতে একখানা ছোট বেত সর্বদাই থাকে, সেইটা লইয়া টলিতে টলিতে গণু মিঞা বাহির হইয়া পড়িলেন। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার জমিদারী মেজাজ খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছে। এই হাটে তাঁহার তিন আনী অংশ আছে, সেদিক দিয়া তিনি হাটের একজন মালিকও বটেন।

গণু মিঞা বেতখানা হাতে লইয়া একেবারে ভিড়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রামকমল অগ্রসর হইলেন না, এসব ব্যাপারে খামোকা মাথা গলাইতে নাই।.. কে জানে কোন্‌ ব্যাটা হয়ত বা হুট করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানের গায়ে হাতই বা তুলিয়া বসিল! তা ছাড়া ভুতপূর্ব

দারোগা, এককালে জাতি-সাপ থাকিলেও বর্তমানে ঢোঁড়ায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। কিল খাইলে বর্তমানে মুখটি চুণ করিয়া সেটি চুরি করিয়া যাইতে হয়, টুঁ শব্দটি করিবার যদি জো থাকে!

কিন্তু নমঃশূদ্র সম্প্রদায় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। রক্ত যতই গরম হোক, জমিদারের পরাক্রম তাহারা জানে। একটু মাথা চাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেই বিঘা-প্রমাণ ধানের জমি এবং মাথা গুঁজিবার হোগ্‌লার চালাটুকু বাকী খাজনার দায়ে সাত দিনের মধ্যেই 'সরকারে' খাস হইয়া যাইবে। সুতরাং—

নমঃশূদ্রের দল শশব্যস্ত হইয়া সেলাম করিল, মাণিক হাত কচলাইয়া বলিল: আজ্ঞে না হুজুর, এই বিশেষ কিছু নয়, সামান্য—

গণু মিঞা মাটিতে লাঠি ঠুকিয়া কহিলেন: না, কোন গোলমাল নয় এখানে। দু'ঘণ্টা ধরে তো সব এখানে বসে মদ টানছ, সরে পড়ো এবার, যা—ও—।

মাতাল বা যাই হোক, জমিদার তো বটে! নমঃশূদ্রেরা উঠিয়া পড়িল, আর কোথাও গিয়া বসিবে। দুই তিনটা বোতল লইয়া গেল তাহারা। কেবল্ পণ্ডিত সটান্ হইয়া পড়িয়া রহিল, টানাটানি করিয়া তাহাকে নাড়ানো গেল না। সে শুধু সংক্ষেপে মন্তব্য করিল: আমি পাখী নই ব্যাটা, স্বয়ং হিমালয়। আমাকে ঘাঁটিস্‌নি, নাড়তে পারবিনে!

বেবাজিয়ারা পরম অবজ্ঞায় হাসিল এবং যেন কিছু হয় নাই, এই ভাবে অতি সহজেই প্রশান্ত হইয়া আসিল। যে লাঠি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল, সে লাঠি ফেলিয়া একটা নতুন বোতল লইয়া বসিল এবং মেয়েটিও যথানিয়মে দলের সকলকে মদ পরিবেশন করিতে লাগিল।

শান্তিস্থাপন করিয়া মত্ত মাতঙ্গের মতো হেলিয়া দুলিয়া গণু মিঞা আবার দোকানে আসিয়া ঢুকিলেন।

…ইহাও সমাজ এবং সমাজের একটা দিক। মূল্য যে ইহার কম, সে কথা কিছুতেই জোর করিয়া বলা চলে না। জীবনে বৃহত্তর আনন্দ-আস্বাদনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত, নিজেদের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্য হইতে অনাবশ্যক, অথচ উন্মাদনার রস তাহাদের নিংড়াইয়া লইতে হয়। জীবন তাহাদের বিস্বাদ, জীবন-নিংড়ানো এ রসটাও তাই সুস্বাদু নয়। অথচ, এ ছাড়া তাহারা বাঁচিবেই বা কী করিয়া? নেশা না হইলে মানুষ তো বাঁচিতে পারে না, তাই নানা দিক হইতে এই অপরিহার্য বস্তুটি তাহাকে সঞ্চয় করিতে হয়। শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, রেস এবং হুইস্কি, সাহিত্য এবং শিল্প সব কিছুর মধ্য হইতেই সেই মাদক রসটি ক্ষরিয়া পড়িতেছে, তাহার বর্ণে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গন্ধে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে নিখিল মানবের মন।

এই নিখিল মানবসমষ্টির তাহারাও এক একটি অংশ, এই আনন্দের রঙে তাহারাও রাঙিয়া উঠিতে চায়। কিন্তু সুযোগ অল্প, পরিসর আরও অল্প। নিজেদের বুকের রক্তে পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া তাহারা পান করে, অথচ পূর্ণপাত্র ওষ্ঠাগ্রে ধরিয়া মদের পরিবর্তে তাহারা নিজেদের আয়ুই যে নিঃশেষ করিয়া চলিয়াছে, এ কথা তাহাদের কে বুঝাইবে?

জীবন বলিতে তাহারা কী বোঝে, বাঁচিবার অর্থই বা তাহাদের কাছে কতটুকু? স্বর্ণপ্রসূ বসুন্ধরা মাটির ভাণ্ডারে তাহাদের জন্য সঞ্চয় রাখিয়া দিয়াছেন, কাদা মাখিয়া, বুকের রক্ত জল করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই নিভৃত ভূমি-ভাণ্ডারটি হইতে তাহারা রত্ন খুঁড়িয়া তোলে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সমস্ত দিনের শেষে যখন জীর্ণ ক্লান্ত দেহে তাহারা দীর্ণ কুটিরে ফিরিয়া আসে, তখন তাহাদের রিক্ত পর্ণপুটে ভরিয়া আনে দারিদ্র্য, ভরিয়া আনে বুভুক্ষা, ভরিয়া আনে রাশীকৃত বঞ্চনা। তারপর সেই বঞ্চনার আঘাতটাকে ভুলিবার জন্য তাহারা তাহাদের

সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফেরে তাড়ির দোকানে, কণ্ঠ-প্রদাহী বিষাক্ত তীব্রতায়। এতবড় বিয়োগান্তও তাহাদের জীবনে কাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ হাটের মধ্যে কিসের একটা গোলযোগ শোনা গেল। মনে হইল, হঠাৎ যেন সমস্ত মানুষগুলিই একসঙ্গে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; যেন ঝড়ের ঝাপটা লাগিয়া বিশাল অরণ্য মর্মরিত হইয়া উঠিল, যেন ডালে পাতায় প্রমত্ত আঘাত বাজাইয়া শোঁ শোঁ করিয়া বৈশাখী ঝড় ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঝড়ের সংঘাতে প্রকৃতির রাজ্যে যত হাহাকারই জাগুক না কেন, সচেতন মানুষের অসহায় মূঢ় কলরবের তুলনা কোথায় মিলিবে?

কালীপদ নিশাচরের মতো দুইটী তীক্ষ্ণ চোখ একবার বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া দিল, তাহার গালে কপালে গোটা কয়েক সন্দিগ্ধ এবং আঁকাবাঁকা কুটিল রেখা পড়িয়াছে। তারপর গণু মিঞার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, দেখেছেন ব্যাপারটা? আবার আজও এসেছে।

গণু মিঞার নেশাটা তখন আরো গাঢ় হইয়া আসিতেছে। জড়াইয়া জড়াইয়া তিনি কহিলেন, কী ব্যাপার? কে এসেছে?

—আসবে আবার কে? আপনার ইস্কুলের ওই প্রফুল্ল মাস্টার, আর তার দলবল আর কি।

রামকমল চমকিয়া উঠিলেন: প্রফুল্ল মাস্টার এসেছে—আবার দলবল নিয়ে! কেন, ফিস্টি করবে নাকি? পাঁঠা কিনতে এসেছে?

—হাঁঃ, পাঁঠা কিনতে না হাতী! কালীপদের কণ্ঠস্বরে রাজ্যের বিরক্তি এবং বিক্ষোভ প্রকাশ পাইল: এসেছে তো আপনাদের আর আমার সর্বনাশ করতে। ঢাক ঢোল পিটিয়ে কী বলছে শুনছেন না? মদ খেয়োনা, জমিদার তালুকদারকে খাজনা দিয়োনা, আরো কী সব, যাননা—দু'পা গেলেই তো শুনতে পাবেন।

—মাম্‌-মানে? জমিদারকে খাজনা দিতে নিষেধ করছে প্রফুল্ল মাস্টার? আমার ইস্কুলে মাস্টারী করে এতখানিই বাড় বেড়েছে তার?

গণু মিঞা কথাটাকে যেন বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না।

—শুনতে চান তো নিজেই যান না। আবার সেই স্বদেশীর ব্যাপার সুরু করেছে আর কি। দু'দিন বাদে যদি ফের মদের দোকানে এসে পিকেটিং সুরু করে, তা হলে আমরা দাঁড়াব কোথায় বলুন? আপনাদের আশ্রয়ে আছি বলে না খেয়ে মরব নাকি?

—বটে!

ছড়িখানা লইয়া গণু মিঞা আর একবার বাহির হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, আসুন তো চাটুয্যে মশাই, ঘটনাটা একবার দেখা যাক।

রামকমল সাহস পাইলেন। এবার আর নমঃশূদ্র কিংবা 'বেবাজিয়া' নয়, ইহারা স্বদেশী এবং ভদ্রলোক। ইহাদের সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধা এই যে, চিরকাল ইহারা মারই খাইয়া থাকে, ফিরিয়া মারিতে জানে না অথবা চায় না। অহিংস বলিয়াই ইহাদের উপরে সহিংস হইয়া ওঠা সব চাইতে সহজ; নিজের সুদীর্ঘ-পুলিশ-জীবনে এ অভিজ্ঞতা রামকমলের বার বার ঘটিয়াছে।

বাহির হইয়াই গণু মিঞা হাঁক পাড়িলেন, মান্‌কে, ওরে মান্‌কে!

মাণিক কাছাকাছি কোথায় ছিল, হাঁক শুনিতেই আসিয়া পড়িল।

—নেশায় তো পা টলছে দেখছি। লাঠি ধরতে পারবি?

মাণিক ভুঁইমালী হাসিয়া উঠিল। হাসির সঙ্গে সঙ্গে কালো মুখের মধ্য হইতে দুই সারি ঝক্‌ঝকে দাঁত বাহির হইয়া পড়িল—কুকুরের দাঁতের মতো তীক্ষ্ণাগ্র। পানের রঙে পুরু দুইটি ঠোঁটে এবং দীর্ঘ দাঁতগুলির গোড়ায় গোড়ায় ময়লা একটা আস্তরণের মতো জমিয়া

আছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে যেন এইমাত্র সে জ্যান্তো মানুষ সাবাড় করিয়া আসিল।

হাসিটাও নিঃশব্দ নয়। নিঃশব্দে হাসিতে সে শেখে নাই, কাতলা মাছের মতো প্রকাণ্ড মুখ এবং পাকা বটফলের মতো রক্তাক্ত চোখ দুইটার দিকে চাহিয়া প্রশান্ত একটা মৃদু হাসির কল্পনা করাও যেন অসম্ভব। হাসিল না তো, যেন শুকনো ঝামা দিয়া কে একটা কালি-মাখা খস্‌খসে কড়াইয়ের পিঠ বার কয়েক ঘস্ ঘস্ করিয়া প্রচণ্ড শব্দে ঘষিয়া দিল।

হাসিয়া মাণিক কহিল: এত সহজেই আমাদের পা টলেনা হুজুর, বরং দুএক পাত্তর পেটে পড়লেই আমাদের হাতে লাঠি নেচে ওঠে। মাথায় খুন না চাপলে মানুষ মারব কী করে? কিন্তু এখন লাঠি ধরে কী করতে হবে?

—ওই একদল স্বদেশী বাবু হাটে এসেছে না? ওদের দু চার ঘা বসিয়ে দিবি আর কি।

—স্বদেশী বাবু? সঙ্গে সঙ্গেই মাণিক ভুঁইমালী একেবারে নিবিয়া গেল। সমুদ্র জুড়িয়া যখন ঝড় উঠিয়াছে, উত্তাল তরঙ্গবিক্ষেপে দিক্‌দিগন্ত আলোড়িত, তখন সে ঢেউয়ের আঘাত এই নির্জন প্রবাল-দ্বীপেও আসিয়া বাজিয়াছে বই কি।

মাণিক সসঙ্কোচে কহিল, তা স্বদেশী বাবুরা তো কোনো খারাপ কথা বলছে না হুজুর। কারো অনিষ্ট করছে না বরং—

—নাঃ—খারাপ কথা বলছে না, সত্যপীরের পাঁচালী শোনাচ্ছে সবাইকে! ঐ সব বক্তৃতে শুনে ভাবছিস বুঝি, জমিদারকে ফাঁকি দিবি! কিন্তু সে গুড়ে বালি, বুঝলি সে গুড়ে বালি। ইংরেজ রাজ্যি এখনো রয়েছে, এখনো আইন আছে, আদালত আছে। এক একটা করে

নালিশ ঠুকবো, তিন দিন বাদেই দেখবি দলে দলে ঘুঘু ভিটেয় চরে বেড়াচ্ছে তোদের।

মাণিক চুপ করিয়া রহিল।

—ধর লাঠি, মারধোর না করিস, তাড়িয়ে দিবি। বলবি, বাবু, তোমাদের ওসব ধাপ্পাবাজিতে আমরা আর ভুলব না, ভালো চাও, তো মানে মানে সরে পড়ো।

মাণিক দ্বিধা করিয়া বলিল, আপনি একবারটি আসবেন না হুজুর?

—না, আমি এই রইলুম দাঁড়িয়ে। আমার ইস্কুলের মাস্টার কি না, দেখলে কিছু একটা ভেবে বসবে আবার। যা এগো তুই। তিন বোতল মদের পয়সা দেব,—যা—

যেটুকু দ্বিধা আসিয়াছিল, 'তিন বোতল' কথাটা কানে ঢুকিতেই সেটা বাষ্প হইয়া উড়িয়া গেল।

—রঘুয়া রে, বলিয়া মাণিক একটা হাঁক ছাড়িল, তারপর এক গাছা লাঠি কুড়াইয়া লইয়া হাটের মধ্যে নামিয়া গেল।

বক্তৃতা বটে, কিন্তু সভা জাঁকাইয়া নয়, আগে হইতে ঢাকঢোল পিটাইয়াও নয়। হাটের মধ্যে অত্যন্ত সহজেই এক সঙ্গে অনেকগুলি মানুষকে সম্মিলিত আকারে পাওয়া যায়, তাই সভা জমাইবার জন্য বিশেষ কোনোরকম চেষ্টা-চরিত্র করা হয় নাই। এত দূর-দূর হইতে এতগুলি মানুষকে একত্র করা সম্ভব নয়, অসুবিধাও অনেক; খুব বেশি না হোক, খানিকটা কাজও তো অন্তত ইহাতে হয়।

কিন্তু আজ প্রফুল্ল নিজে আসে নাই, মুকুল আসিয়াছিল তাহার প্রতিনিধি হইয়া। সঙ্গে আরো তিন চারটি ছেলে, হাটের এলোমেলো জনতাকে তাহারাই বড় বট গাছটার তলায় ভিড়াইয়া আনিয়াছিল।

এই বটগাছ বস্তুটি প্রত্যেকটি হাটেরই বিশেষত্ব; ঝুড়িনামানো সুপ্রাচীন একটি গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় একটি কালীর থান অথবা পীরের দরগা, ইহাই হাটের বারোয়ারীতলা বা কেন্দ্রস্থল।

চাষী মজুরের মোটামুটি একটা ভিড জমিয়াছিল ভালোই। স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ তাহাদের দুয়ারে আরো দু'-একবার না আসিয়াছিল তা নয়, এবং সে তরঙ্গও তাহাদের জীবনকে কম আলোড়িত করে নাই; তাহারা সাড়া দিয়াছিল, তাহাদের সাধ্যমতোই সাড়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার বিনিময়ে তাহাদের কোনো প্রতিশ্রুতিই পূর্ণ হয় নাই। অভাব-অভিযোগের শূন্য পাত্রটি হাতে লইয়া ব্যর্থ বেদনায় তাহারা ঘরে ফিরিয়া গিয়াছিল। সেই দিন হইতেই সমাজের অগ্রগামী দল, এই চিরন্তন ভদ্র-লোক শ্রেণীর প্রতি তাহারা বিশ্বাস হারাইয়াছে, ইহাদের প্রতিটি কল্যাণ চেষ্টাকেই তীক্ষ্ণ সন্দেহে বিশ্লেষণ করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া কাজের কথা তো কেউ তাহাদের বলিবার চেষ্টা করে নাই, তাহাদের অতি-বাস্তব দুঃখ-বেদনার কাহিনী তো কেউ এমন করিয়া তাহাদের কোনো দিন শুনাইতে আসে নাই। জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সহসা একটা অতি রূঢ় চীৎকারে সমস্ত ব্যাপারটারই যেন সুর কাটিয়া গেল।

মাণিক ভূঁইমালীর দল হৈ হৈ করিয়া আসিয়া পড়িল সভার মধ্যে—সভা ভাঙিয়া দিবে তাহারা। একটা প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা কোথা হইতে বন্যার মতো আসিয়া সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া গেল। অবাক বিস্ময়ে মুকুল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সঙ্গী যে দুই চারটি ছেলে অগ্রসর হইয়া গোলমাল থামাইবার চেষ্টা করিল, তাহাদের ঘাড়েও দু'চার ঘা লাঠি না পড়িল, তা নয়।

মুকুল বিব্রত হইয়া বলিল: আহা-হা, তোমরা গোলমাল করছ কেন? মারামারির কী হয়েছে?

জনতা গর্জন করিয়া উঠিল। তিমির-তীর্থের নিবিড় অন্ধকারে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মৃত্যুর জারকরসে যাহারা জীর্ণ হইয়াছে, এই মুহূর্তে কি উদয়-দিগন্তে তাহারা নূতন উষার স্বর্ণ-দ্বারের উন্মোচনী দেখিতে পাইল? নবজীবনের আনন্দ-স্পন্দনে তাহাদের বেদনাহত মৃত্যুকল্প প্রহরগুলি কি মর্মরিত হইয়া উঠিল?

কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, ব্যাটারা মদ খেয়ে মাতলামো করতে এসেছে এখানে! ঘাড় ধরে বের ক'রে দাও হতভাগা বদমায়েসদের।

ভীড়ের মধ্যে মাণিক ভুঁইমালী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। হাতে তাহার ছয় হাত লম্বা একখানা লাঠি—সেখানা সে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিল, ঘাড় ধরে বের করে দেবে! কার বুকের পাটা আছে, এগিয়ে এসো।

জনতা সরিয়া দাঁড়াইল! মাণিক ভুঁইমালীকে তাহারা চেনে। মদে এবং গুণ্ডামিতে সে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, সুযোগ পাইলে ডাকাতি করিয়া থাকে—এমনও জনশ্রুতি আছে। তাই দূর হইতে দাঁড়াইয়া তাহারা যথেচ্ছ গালিবর্ষণ করিতে লাগিল, আগাইয়া আসিল না।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই—

কোথা হইতে "বেবাজিয়া'র দল আসিয়া মাথা গলাইল। মারামারির ব্যাপার দেখিলে রক্ত তাহাদের মাতাল হইয়া ওঠে, বৈচিত্র্যহীন জীবনটাকে তাহারা রক্তারক্তির আস্বাদ দিয়া সুস্বাদু করিয়া লইতে চায়। আশ্রয়হীন মানুষের দল, স্রোতের শ্যাওলার মতো পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে ভাসিয়া চলে তাহাদের যাযাবর প্রাণ-যাত্রা; অই এই

চলচ্ছন্দে যেখানে যে ঘূর্ণিটি আসে, সেখানেই একটি পাক না ঘুরিয়া তাহারা আগাইতে পারে না। তা ছাড়া একটু আগেই এই নমঃশূদ্রদের সঙ্গে যে সংঘাতটি তাহাদের বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল, সে কথাও এর মধ্যেই তাহারা ভুলিয়া যায় নাই।

"বেবাজিয়া"রা আসিয়া পড়িয়াছে। মারিতে এবং মরিতে তাহারা ভয় পায়না, ষোড়শী বেদেনী মেয়ে কালো চোখে বাঁকা বিদ্যুৎ হানিতে হানিতে যে কোন মুহূর্তেই ষোলো ইঞ্চি লম্বা একখানা ছোরা বাহির করিয়া বসিতে পারে!

চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে মাণিক ভুঁইমালীর দল অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনটা তিরিশেব বোতলের জন্য জীবনের মায়া তাহারা ছাড়িতে পারে না।···

···আবার বক্তৃতা চলিতে লাগিল।

* * * * *

তারপরে ঝড় উঠিল।

শীত শেষ হইয়া আসিতেছে—পৃথিবী জুড়িয়া বসন্তের আভাস লাগিল। কাছারী ঘরের সামনে অশত্থ গাছটার ঝরিয়া-যাওয়া পাতার ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল শ্যামলতা নতুন পৃথিবীর আলো মাখিয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে, সামনে মেটে পথটা হইতে একটু একটু ধুলা উড়িতেছে আজকাল। একটু দূরেই খালের ধারে তিন চারটি পত্রহীন শিমূলের গাছে যেন রক্তের ছোপ ধরিয়াছে।

রাসু সেন ফরাসে বসিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন, প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনেও কেমন একটা বিবর্তন আসে সম্ভবত। দলিলপত্র এবং সেক্রেটারীর কর্তব্য,—ইত্যাদি, সব কিছুকে ডিঙাইয়া তাঁহার মন একটা অকারণ খুশিতে ভরিয়া উঠিতেছিল। তা, ইস্কুলটার

ইহারই মধ্যে বেশ উন্নতি হইয়াছে কিন্তু। ছেলেগুলার দুরন্তপনা কমিয়া গিয়াছে, কোমর বাঁধিয়া পল্লী সংস্কারে লাগিয়াছে তাহারা। কলাবাড়িয়া হইতে আসিবার পথটা এক জায়গায় অনেকখানি ভাঙিয়া নামিয়াছে, বর্ষার সময় সেখান দিয়া আড়িয়ল খাঁর জল কলকল করিয়া ছুটিয়া যায়, পারাপারটা রীতিমতো বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা কোদাল লইয়া ছুটির দিনে সেখানে বাঁধ বাঁধিতে গিয়াছে। ফুটবল টিমটা ভালো হইয়া উঠিতেছে, উজিরপুর হইতে এবার কাপ জিতিয়া আনিতে পারিবে আশা হয়। মাহিলাডার খালে কী অসম্ভব কচুরিপানাই জমিয়াছিল, প্রাণপণে তিনখানা লগি ঠেলিয়াও এক মাল্লাই নৌকা তিন হাতের বেশি আগাইতে পারিত না। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের কাছে বিস্তর লেখালেখি করিয়াও কোনো ফল হয় নাই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কী ব্যাপারটাই না প্রফুল্ল করিয়া ফেলিল! দু' মাইল আন্দাজ কচুরি বন প্রায় পরিষ্কার, উঁচু রাস্তার পাশে পাশে স্তূপাকারে তাহারা জমিয়া আছে।

রাসু সেন গড়গড়া টানিতে টানিতে ভাবিতেছিলেন, আগামী মিটিঙে প্রফুল্লের বেতন কিছু বাড়াইয়া দেওয়া চলে কি না! পঁয়তাল্লিশ টাকায় কোনো ভদ্র সন্তানের ভদ্রভাবে চলা অসম্ভব। প্রেসিডেন্টকে একটু অনুরোধ করিতে হইবে। আর তিনি তো নিজেই ইস্কুলের সেক্রেটারী, যা করিবেন তাহার উপর কথা কহিবে, এমন দুঃসাহস এই বাসুদেবপুর, নলসিঁড়ি বা চণ্ডপাশা গ্রামে কাহার আছে?

কিন্তু এমন হিত চিন্তায় সহসা বাধা পড়িয়া গেল।

ভূতপূর্ব দারোগা রামকমল চাটুয্যে এবং পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি সুরেন মজুমদার কোথা হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া হাজির। রামকমলের ইঁদুরের মতো শুকনো ছোট মুখখানি একধরণের ভয়ে আর উদ্বেগে ছুঁচোর মতো

লম্বা হইয়া গিয়াছে, সুরেন মজুমদারের লাল টুকটুকে ফুলো গাল দুটি আরো ফুলিয়া উঠিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন দুই গালে তিনি দুইটি কয়েৎবেল পুরিয়া আসিয়াছেন।

রাসমোহন আপ্যায়ন করিয়া কহিলেন: আসুন, আসুন। তারপর, এই সকালেই কী মনে করে? ওরে কানাই, আর দু'পেয়ালা চা—

কিন্তু অভ্যর্থনা করিবার দরকার ছিল না। তাঁহারা নিজেরাই আসিয়া জাঁকাইয়া বসিলেন এবং এই সুমধুর আতিথ্যের বিনিময়ে যে কয়টি কথামৃত তাঁহারা বর্ষণ করিলেন, তাহাতে রাসু সেন স্তব্ধ হইয়া গেলেন। যেন চড় চড় করিয়া এক রাশ ইট-পাটকেল সম্পূর্ণ বিনা নোটীশেই তাঁহার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইল।

কথা কহিলেন সুরেন মজুমদার। অবশ্য বলিবার জন্য রামকমলই বেশী ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কিন্তু ডেপুটির সামনে দারোগা এতখানি ধৃষ্টতা করিবেন তাহার জো-কি!

—বসব তো মশাই, কিন্তু তার আগে যে গোষ্ঠীশুদ্ধ জেলে যেতে হচ্ছে বলি, সে খবরটা রাখেন? হাতকড়া, হুঁ হুঁ—হাতকড়া চেনেন?

রাসু সেন চমকিয়া বলিলেন, তার মানে?

—মানে অত্যন্ত পরিষ্কার। খেজুর রস চুরি করবে, গুণ্ডামি করবে, ভদ্রলোকের কথার মাঝখানে শেয়াল ডাকবে, তখন তো ভারী প্রশ্রয় দিলেন এ-সবের। এখন বুঝুন ঠেলা! হেড মাস্টার, সেক্রেটারী, প্রেসিডেন্ট, কমিটি—মায় ইস্কুলকে ইস্কুল এবার শ্রীঘর ঘুরে আসুন।

সেক্রেটারী বিবর্ণ হইয়া কহিলেন, এসব আপনি কী বলছেন?

—যা বলছি তা ভয়ানক কথা। আপনার হেড মাস্টারটি তো আর সোজা নয়—এক নম্বর পলিটিক্যাল গুণ্ডা। দেখছেন ?

সুরেন মজুমদার পকেট হইতে খর খর করিয়া একখানা হলদে কাগজ বাহির করিয়া রাসু সেনের নাকের সামনে মেলিয়া ধরিলেন : পড়ুন, পড়ুন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ওয়ার্ণিং। লিখেছেন, মহামান্য সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়েছে যে, বাসুদেবপুর ইস্কুলে সম্প্রতি লেখাপড়ার চাইতে রাজনীতির চর্চাই পুরোদমে চলছে। বলা বাহুল্য, জিনিষটা নির্দোষ নয়। সুতরাং অবিলম্বে যদি এ সব বন্ধ না হয়, তা হলে সরকার বাহাদুর এ জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। আর সেই সঙ্গে এই মর্মে নিম্নলিখিত ব্যাক্তিদের ওপরও কোনো রকম সভা-সমিতি নিষেধ করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী করা হল।

ইহার নীচেই এক সারি নাম। রাসমোহন দেখিলেন তিনি নিজেও সে তালিকার বাহিরে পড়েন নাই।

রাসু সেন সভয়ে বলিলেন, এ তো সর্বনেশে ব্যাপার মশাই! গ্রামের উন্নতির জন্য কতগুলো ভালো কাজ হচ্ছে, ছেলেরা খাটছে আপ্রাণ, এমন একটা পাবলিক ওয়েলফেয়ার কি-না অপরাধ হয়ে গেল!

সুরেন মজুমদার কিছু বলিবার আগেই রামকমল ফস করিয়া কথাটা তুলিয়া লইলেন, রাখুন আপনার পাবলিক ওয়েলফেয়ার! ওসব পাবলিক ওয়েলফেয়ার আসলে যে কি, গবর্ণমেণ্ট সেটা বেশ বোঝে। এ আর কিছু নয় মশাই, সেরেফ বোমা পিস্তলের কারবার, নইলে—

—বোমা পিস্তলের ব্যাপার! হতেই পারে না।

সুরেন মজুমদার ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, তা আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এখন পনেরো

দিনের নোটিশে হেড মাস্টারকে তাড়াবেন কি না, জানতে চাই। যদি না তাড়ান, তা হলে শ্রীঘরের জন্যে তৈরী থাকুন।

রাস্থ সেন জড়াইয়া জড়াইয়া কহিলেন, তা হলে প্রেসিডেন্টকে একটা খবর—

রামকমল সাগ্রহে বলিলেন, গণু মিঞাকে? তাঁকে আর খবর দিতে হবে না, তিনিই আমাদের খবর পাঠিয়েছেন। আপনি বরং এখুনি হেড মাস্টারকে ডেকে—

রাস্থ সেন বিপন্ন মুখে বলিলেন, কোথায় হেডমাস্টার? তিনি তো মাহিলাড়ার খালে কচুরি পানা সাফ করতে গেলেন সকাল বেলা—

—আর কচুরি পানা সাফ করতে গিয়ে সকলের পরকালও সাফ করে ফেললেন। এখনি তাঁকে ডাকতে লোক পাঠান, তারপর একমাসের মাইনে দিয়ে পত্রপাঠ বিদেয় করুন। আমরা ছুটলুম অন্যান্য মেম্বারদের কাছে, দেখি তাঁরা কী বলেন!

দারোগা এবং ডেপুটি যেমন ঝড়ের মতো আসিয়াছিলেন, অদৃশ্য হইলেনও তেমনি ঝড়ের মতোই; কিন্তু সেক্রেটারীকে তাঁহারা রাখিয়া গেলেন দারুভূতমুরারি করিয়া। না পারিলেন তিনি নড়িতে, না পারিলেন চড়িতে। গড়গড়ার দামী বিষ্ণুপুরী তামাকটা অনাদরেই পুড়িয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল।

যথা সময়ে খবরটা পাইল সকলেই।

মুকুল আসিল, নন্তু আসিল, পাড়ার আরো পাঁচ সাতটি ছেলে আসিয়া জুটিল। রবি আসিতে পারে নাই, সে নাকি পেটের অসুখে শয্যাগত হইয়া আছে। এতদিন ধরিয়া যে প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিবার

জন্য তাহারা নিজেদের সমস্ত উৎসাহ-উদ্দীপনাকে পণ-বদ্ধ করিয়া লইয়াছিল, সেই সংগঠনার অর্ধেকটাও অগ্রসর হইতে না হইতেই তাহাদের উপর দারুণ দুর্দিন নামিয়া আসিল। একটা নিষ্ঠুর পরীক্ষার সামনে দাঁড়াইয়া আজ তাহাদের ভবিষ্যৎকে নির্ধারিত করিয়া লইতে হইবে। সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহার পরিণতি যে কী দাঁড়াইবে, সেটা অনুমান করাও খুব বেশী অসম্ভব নয়। তবু পিছাইলে তো চলে না, যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইয়াই গিয়াছে, তখন মৃত্যু পর্যন্ত কামানের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলাই সৈনিকের ধর্ম।

প্রফুল্ল বলিল: ইস্কুল কমিটি আমাকে পনের দিনের নোটিশ দিয়েছেন। যেদিক থেকেই হোক, চলে আমাকে যেতে হবেই এবং তার জন্যে আমরা সবাই প্রস্তুত।

মুকুল চিন্তিত হইয়া কহিল: তা হ'লে কয়েকদিনের মধ্যেই বড় মিটিংটার বন্দোবস্ত করতে হয়।

প্রফুল্ল বলিল: তা বই কি। কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ আছে, এর ফলে অনেককেই সরকারের অতিথি হতে হবে। সেই জন্যেই আপাতত আপনাকে এই ব্যাপারের বাইরে থাকতে হবে মুকুল বাবু। এর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমস্ত কাজের প্রোগ্রাম যাতে নষ্ট না হয়, সে দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

নন্তু উঠিয়া দাঁড়াইল। চিরদিন ধরিয়া তাহাকে সকলে অপব্যয়ের খরচেই হিসাব করিয়া আসিয়াছে, তাই এই মুহূর্তের বিচারহীন ভাব চঞ্চল আত্ম-অপচয়ে সে অনায়াসে অগ্রণী হইতে পারিয়াছে। শিক্ষা তাহার প্রচুর নয়, তাই সে রবির মতো তর্ক করিতে পারে নাই; বুদ্ধির পরিমিতি তাহার সঙ্কীর্ণ তাই বিচারের কুয়াসায় নিজের দৃষ্টিকে সে সমাচ্ছন্ন বোধ করে নাই।

নন্তু কহিল : আমি চললুম। নমঃশূদ্র আর বৈরাগীদের খবরটা দিচ্ছি, ওখান থেকে একবার মুসলমান পাড়ার দিকেও যেতে হবে। গণু মিঞা নাকি গবর্ণমেণ্টের নাম করে আমাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। কাজেই আজ থেকে ওদের একবারটি নাড়াচাড়া দিয়ে আসা দরকার।

নন্তু দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটাই কিন্তু নীলিমার কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হইল। স্পষ্ট করিয়া বিশেষ কিছু সে যে বুঝিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু আকাশ-বাতাসে যে ঝড় মেঘে মেঘে কালো হইয়া আসিয়া নামিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল, নিতান্ত অনায়াসেই সে তাহা টের পাইয়া গিয়াছে।

আর তাহারই বিদ্যুৎ চমক রাস্তু সেনের মুখে।

যৌবনে তিনি নাকি এ অঞ্চলের ডাকসাঁইটে জমিদার ছিলেন, তাঁহার বাবোখানা ছিপ রাত্রির ঘন অন্ধকারে আড়িয়ল খাঁয় ডাকাতি করিয়া বেড়াইত; কিন্তু এ বয়সে তাঁহাকে দেখিয়া সে কথা কল্পনাও করা চলে না। সরল, পরোপকারী, ইস্কুলের সেক্রেটারিত্ব লাভ করিয়া এমন স্বসম্পূর্ণ হইয়াই আছেন যে কাহারো বিরুদ্ধে এতটুকু অভিযোগ অবধি তাঁহার নাই। কিন্তু আজ তাঁহার একি ভাবান্তর ঘটিল! নীলিমা আন্তরিক বিস্মিত হইয়া গেল।

প্রফুল্ল তাহাকে যে বইখানা দিয়াছিল, সে বইখানা সে আগাগোড়া পড়িয়াছে। নিজের সমস্ত বুদ্ধি, এতদিনের অনাদৃত সমস্ত শক্তিকেই সংহত করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াছে। কতটুকু বুঝিয়াছে, সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বুঝিবার চেষ্টাতে ত্রুটি করে নাই এবং প্রফুল্লের সম্বন্ধে তাহার যে মনোভাব, এ উপলক্ষে সে মনোভাবের কোনো পরিবর্তন তাহার

ঘটে নাই ; শুধু এইটুকু সে বুঝিয়াছে—প্রফুল্লকে সে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, প্রফুল্ল সেভাবে তাহাকে দেখিতে চায়না।

ভাবিল : একটিবার সে প্রফুল্লের সঙ্গে দেখা করিয়া আসে, কিন্তু সুযোগও পাইলনা, অবসরও মিলিল না। তারপর এক সময় সুযোগ সে নিজেই করিয়া লইল। কাজটা দুঃসাহসিক কিন্তু উপায়ান্তর ছিলনা।

রাত্রি গভীর—বড় বাড়ীর উপর দিয়া প্রসুপ্তির নিশ্চিন্ত প্রশান্তি! নীলিমা বাহির হইয়া পড়িল। অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়া হাতড়িয়া হাতড়িয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। প্রফুল্ল এখনও ঘুমায় নাই। তাহার টেবিলে বাতি জ্বলিতেছে, কী লিখিতেছে সে। নীলিমা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সোজা তাহার জানালাটার সামনে দাঁড়াইল।

প্রফুল্ল চমকিয়া উঠিল। মানুষের সাড়া পাইবামাত্র তাহার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল : কে?

নীলিমা সভয়ে ফিস ফিস করিয়া কহিল : চেঁচাবেন না, আমি।

—আপনি! প্রফুল্ল চোখ মুখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, এত রাত্তিরে কোত্থেকে এলেন?

সে কথার জবাব না দিয়াই নীলিমা বলিল : আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন?

এই মুহূর্তে নীলিমাকে এমন অপরূপ এমন অপূর্ব-সুন্দরীই মনে হইতেছে! জানালার গরাদে ধরিয়া সে দাঁড়াইয়াছে, বাহিরে অন্ধকারের পট ভূমিকা, ঘরের আলো হইতে খানিকটা দীপ্তি তাহার মুখে পড়িয়া সেই মুখখানাকে বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছে। ভীত উদ্বিগ্ন আর্ত তাহার দৃষ্টি।

—হাঁ, বাধ্য হয়ে চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু সে তো আপনি জানেনই। তা জানবার জন্যই এত রাত্রে এসেছেন নাকি?

—আবার কবে আসবেন? আবেগে নীলিমার স্বর কাঁপিতে লাগিল।

—জানিনে। খুব সম্ভব আর কোনোদিনই আসবো না।

—মানে?

প্রফুল্ল হাসিয়া কহিল: কারণ প্রথমত কিছুদিনের জন্যে যেতে হবে সরকারের অতিথিশালায়। সেখান থেকে যদি নিরাপদে বেরোতে পারি, তা হলেও শেষ পর্যন্ত টানে টানে কোথায় গিয়ে যে পৌছব, তা আগে থেকেই কী বলতে পারি, বলুন?

নীলিমা হঠাৎ গরাদের উপর আরো বেশি করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, হাত বাড়াইয়া প্রফুল্লের একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। গরাদে না থাকিলে হয়তো আরো অনেকখানিই সে করিয়া ফেলিতে পারিত। প্রফুল্লের সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু হাতখানা সে ছাড়াইয়া নিতে পারিল না।

—আপনি যেতে পারবেন না, কিছুতেই না। আমি যেতে দেব না আপনাকে।

বিপন্ন হইয়া প্রফুল্ল বলিল: একি ছেলেমানুষি আরম্ভ করলেন আপনি! না গেলে চলে! পনেরো দিনের নোটিশ পেয়েছি, চাকরী শেষ হয়ে গেছে—

—ওসব আমি কিছু বুঝিনে—নীলিমা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করিল: আপনি যাবেন না, তা হলে আমি কিছুতেই বাঁচবনা।

—আপনি কাঁদছেন নাকি! এমন পাগল তো দেখিনি!

নীলিমা জবাব দিলনা, কাঁদিতেই লাগিল। তাহার শ্যামল মুখখানি বাহিয়া চোখের জল পড়িতেছে, কান্নার বেগে তাহার বুক ফুলিয়া

উঠিতেছে, মুখের উপর দু'খানি হাত চাপিয়া সে কান্নার আবেগ রোধ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

প্রফুল্ল যে কী বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে, ভাবিয়া পাইলনা। ধীরে ধীরে সে জানালার কাছে সরিয়া আসিল, নীলিমার মাথার উপর হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল : শান্ত হোন, যা ঘটবেই তার জন্যে বিচলিত হয়ে লাভ নেই। ভবিষ্যতের আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে।

জলভরা চোখ তুলিয়া নীলিমা তাহার দিকে তাকাইল।......

শুক্লা ওদিকে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। তপনদা তাহার কাছে ধরা দিল বটে, কিন্তু সেজন্য নিজেকে সে এতটা অপরাধী মনে করিল কেন? সেই হইতে সে অদৃশ্য হইয়াছে, আর এদিকে পা বাড়ায় না! কিন্তু এ ধারণা তাহার কেমন করিয়া জন্মিল যে শুক্লাকে সে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে? তাহাকে ভাঙিতে পারা না পারা অনেকটা তাহার নিজের দৃঢ়তার উপরেই নির্ভর করেনা? আর ধ্বংসের অর্থ যে সকলের কাছে এক হইবে, তাহারই বা কি মানে আছে?

কিন্তু তপন দা কবি, তপন দা আইডিয়ালিস্ট। ভাবের প্রেরণায় মন যাহাদের চলে, জীবনকে ব্যাখ্যা করে তাহারা কল্পনার অত্যন্ত কাছ ঘেঁষিয়া; অল্পে আহত হয়, অল্পে খুশি হইয়া উঠে। কিন্তু এমন স্পর্শ-কাতর মন লইয়া তো বস্তু-পৃথিবীতে চলেনা। তপন দা'কে সেকি এই মাটির পৃথিবীর উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না, নিজের শক্তির উপর এতটুকু বিশ্বাস কি তাহার নাই?

শুক্লা বড় আয়নাটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যিই সে রূপবতী,—একথা বিনয় করিয়াও অস্বীকার করা যায়না। কিছুদিন আগেই অসুখ হইতে উঠিয়াছে। শরীর সবটা না সারিলেও যেটুকু

পাণ্ডুরতা আছে, তাহাতে সৌন্দর্য যেন বাড়িয়াই গিয়াছে। যৌবন যাহাকে বলা যায়, সে বস্তু তাহার পূর্ণাঙ্গ শরীরের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, উপচাইয়া পড়িবার অপেক্ষা মাত্র। শুক্লার হঠাৎ মনে হইল, রূপ তাহার তীব্র, আগুনের মতো উজ্জ্বল। তপন দা'র ভয় পাওয়া হয়তো আশ্চয নয়। শুক্লাকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজেকেই সে রক্ষা করিল নাকি?

এদিকে মীটিংয়ের কথাটা দিকে দিকে রাষ্ট্র হইয়া যাইতে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় লাগিল। জাতির বর্তমান অবস্থার উন্নতি-সম্পর্কে বক্তৃতা করিবে প্রফুল্ল। দেশকে যাহারা ভালোবাসে, মানুষের মতো করিয়া যাহারা বাঁচিতে চায়, অন্নবস্ত্রের সমস্যায় যাহারা কাতর, তাহাদের উপস্থিতি প্রার্থনীয়ঃ জীর্ণ কুটিরের মধ্যে যাহাদের নিষেধ-ভাঙা বৃষ্টির জল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, পৃথিবীর রাশি রাশি প্রাচুর্যের মধ্যে উপবাস যাহাদের দৈনন্দিন; যাহারা নিজেদের রক্ত ঢালিয়া পরের জন্য ক্ষেত্র ভরিয়া সোণার ফসল উৎপাদন করে, যাহাদের হাড়ের পাহাড় স্তূপাকার হইয়া এই আলো-উৎসব মুখরিত বিংশ-শতাব্দীকে গড়িয়া তুলিল, আজ তাহাদের সংঘবদ্ধ হইবার, একত্র হইবার পরমতম প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের মুখে সাড়া দিবে না এমন কে আছে।

গ্রামের বিভিন্ন স্নায়ু-কেন্দ্রে এই কথাগুলি বিভিন্ন রকমের স্পন্দন জাগাইল।

রসময় কহিল, গ্রামে কিসের একটা মীটিং হবে শুনেছিস রে?

শশিকান্ত পান চিবাইতেছিল, ফিক করিয়া খানিকটা পিক ফেলিয়া বলিল, অমন কত মীটিং সহরে হামেশাই হচ্ছে। আমি যখন বরিশালে দরজির দোকানে কাজ করতুম, তখন কতবার ভলান্টেরী করেছি।

তোদের কাছে এসব নতুন লাগবে বটে, কিন্তু এ শর্মা ওসব বিস্তর চেটে এসেছেন, জানলি ?

টোনা হুঁ হুঁ করিয়া একটা সুর ভাঁজিতেছিল, এতক্ষণে এদিকে দৃষ্টি পড়িল তার।

—আরে, কী রকমের মিটিংটা হবে বল্ দিকি? মেয়ে মানুষ বক্তা আসবে? খ্যামটা কিংবা ঢপ্ কেত্তন হবে নাকি দু' এক পালা ?

শশিকান্ত কহিল, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ করেই তুই গেলি। স্বদেশীর ব্যাপার বাবা এসব, খ্যামটা যা চলবে তা পুলিশের লাঠি। ইচ্ছে থাকলে নাম লেখা গিয়ে, দিন কয়েক সদরের জেলখানা থেকে দিব্যি ঘানি ঘুরিয়ে আসবি।

টোনা অবজ্ঞা ভরে বলিল, ওঃ, আবার সেই স্বদেশীর ব্যাপার? মেয়েমানুষ নেই, রস-কষের কারবার নেই, ওর মধ্যে কে মরতে যাচ্ছে ? আমি এখন খাসা আছি, বুঝলি! পাঁচিকে বাগিয়েছি।

রসময় ও শশিকান্ত সমস্বরে কহিল, বটে ?

—তা না তো কি। মধু মণ্ডল বাড়ীতে নেই কিনা আজকাল। কিন্তু খবর্দার, কাউকে বলিস্‌নি। মণ্ডল ব্যাটা আবার ভারী এক রোখা, একবার টেরটি পেলে আর রক্ষে রাখবে না।

রসময় কহিল, পাগল, একথা বলি কাউকে ?

শশিকান্ত কিন্তু কোনো জবাব দিল না। তাহার দীপ্তিহীন চোখ দুইটা লোভে আর হিংসায় যেন জলিতেছে। আচ্ছা, তোমার সময় তাহা হইলে ঘনাইয়াই আসিয়াছে। আর দুইটা দিন অপেক্ষা করো শুধু। পানে রাঙা বড় বড় দুইটা দাঁত দিয়া শশিকান্ত সামনের ঠোঁটটা কামড়াইতে লাগিল।

ওদিকে নলসিঁড়ি বাজারে খবরটা পাইয়া সনাতন ভীত হইয়া উঠিল।

কহিল, ওহে মুকুন্দ, বলে কি হে এরা? আবার নাকি স্বদেশী করবার সুরু হয়ে গেল গ্রামে?

মুকুন্দ সবে তাহার মুদিখানার ঝাঁপ খুলিয়া সিদ্ধিদাতা গণেশের উদ্দেশে বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতেছিল। সনাতনের প্রশ্নে সে মন্ত্র তাহার ভুল হইয়া গেল। কহিল, তাই তো শুনছি।

সন্ত্রস্ত হইয়া সনাতন কহিল, তবে তো ভয়ানক কথা হল। আবার কি বিলিতী বয়কট আর দোকানে দোকানে পিকেটিং করে বেড়াবে নাকি?

মুকুন্দ আশ্বাস দিয়া কহিল, কিন্তু তোমার ভয় কী তাতে? নাকের সামনে তো স্বদেশী-বস্ত্রালয় নাম দিয়ে একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়েই রেখেছ।

—গোল্লায় যাক তোমার সাইনবোর্ড। ওটা সামনে ঝুলিয়েছি বলেই সব স্বদেশী মাল ঘরে এনে মজুত করেছি, না? বলে, স্বদেশী আর স্বদেশী। স্বদেশীতে যেখানে মুনাফা হয় এক আনা, বিলিতীতে সেখানে হয় দু' আনা। ম্যাঞ্চেস্টারী কাপড়ে গুদাম আমি বোঝাই করে রেখেছি, ঘরের পয়সা জলে দিয়ে অমন স্বদেশী আমার পোষায় না।

মুকুন্দ হাসিয়া বলিল, দেখো, এবার এসে আগুন লাগিয়ে দেবে সব।

—এঃ, আগুন লাগিয়ে দেবে? সাতশো টাকার কাপড় মজুদ আমার ঘরে, আগুন লাগানো একটা ইয়াকি হল আর কি? লাঠি নিয়ে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকব না? যিনি এগিয়ে আসবেন, আগে তাঁকে দু চার ঘা ঝেড়ে পরে অন্য কথা।

মুকুন্দ হাসিয়া বলিল, ভয় নেই ভয় নেই। এ সব আদপেই সে

ব্যাপার নয়। এ চাষাভূষোদের নিয়ে কারবার, গান্ধী মহারাজ এখানে বাতিল।

—গান্ধী মহারাজ এখানে বাতিল! বলিস কি রে? সনাতন অসীম বিস্ময়ে চোখের তারা দুইটা বড় বড় গোঁড়া লেবুর মতো করিয়া কহিল, গান্ধী মহারাজ নেই তো এ কেমনধারা স্বদেশী!

মুকুন্দ বিজ্ঞের মতো চোখ টিপিয়া বলিল, হালের স্বদেশীই এই রকম। তোমরা সেকেলে মানুষ, এসব বুঝবে না। গান্ধী মহারাজ ওল্‌ড-ফুল হয়ে উঠেছে আজকাল।

—ওল্‌ড-ফুল হয়েছে গান্ধী মহারাজ! সনাতন ভয়ঙ্কর রকমের একটা বীররসাত্মক ভঙ্গি করিল, তবে তো এরা কচু স্বদেশী করছে! ওসব ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই, পায়ে ধরে সাধলেও আমি নেই।

দেখিয়া মনে হইল, ওসব ব্যাপারের মধ্যে যাইবার জন্য সত্যি সত্যিই কেউ তার পায়ে ধরে সাধাসাধি করিতেছে। টানিয়া টানিয়া বলিয়া চলিল, গান্ধী মহারাজ, ওরে বাবা! তিনি কি সোজা লোক নাকি? সাক্ষাৎ কলিযুগে নারদ-অবতার, ভক্তিমার্গের গুরু।

দিনকতক আগেই বাজারে লক্ষ্মীকান্ত ঠাকুরের কথকতা হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এ সময় তাহার সে ভাব দেখিলে কে বলিবে, মাত্র কয়েক মিনিট আগেই স্বদেশীওয়ালাদের নামে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল!

আর চকিত হইয়া উঠিলেন অনাথ কবিরাজ।

বয়স তাঁহার ষাটের কাছাকাছি, কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জীবনটা কী ভাবেই যে কাটিতেছে। স্ত্রী মরিলেন, বিধবা মেয়েটা গর্ভবতী হইয়া আত্মহত্যা করিল, ছেলেটা কোথায় যে দেশত্যাগী হইয়া

গেল, আজ পনেরো বৎসরের মধ্যে তাহার সন্ধান মেলে নাই। সংসারে তিনি একা। বৈদ্যের ছেলে মূর্খ হইলে কবিরাজী করে, কিন্তু কবিরাজ-প্রধান বরিশালের গ্রামে তাহাতে করিয়া খাওয়া অসম্ভব। অনেকবার ভাবিয়াছেন, গ্রাম ছাড়িয়া আর কোথাও চলিয়া যাইবেন, নূতন জায়গায়, নূতন পরিবেশের মধ্যে গিয়া পড়িতে পারিলে কিছু না কিছু হইবেই; অন্তত এ রকম কঠোর উঞ্ছবৃত্তির মধ্য দিয়া যে দিন কাটাইতে হইবে না তাহা নিশ্চিত।

কিন্তু তবু তিনি গ্রাম ছাড়িয়া নড়িতে পারেন নাই। আজ তাঁহাকে দেখিলে বিশ্বাস হয় না, সত্যি সত্যিই বিশ্বাস হয় না; কিন্তু একদিন তো যৌবন তাঁহারও ছিল। তিরিশ বৎসর আগে অনাথ কবি-রাজ স্ত্রীকে হারাইয়াছেন। হারাইয়া সে কি সত্যিই গিয়াছে! ওই যে খালের ধারে ধারে বাঁশের বন যেখানে ঘন হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া হলদে জলে কালো কালো ছায়া ফেলিয়াছে; স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডায় আর বাঁশপাতা ঝরিয়া ঝরিয়া সেখানে ছোট একটি মাটির বেদী প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; বৃষ্টির জলে বেদীটি ধুইয়া যায়, মৃত-জ্যোৎস্নায় বাঁশের পাতা আলো-আঁধারের মায়াজাল বিছাইয়া দেয়। ওটি তাঁহার স্ত্রীর চিতা। উহারি পাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা পড়িয়া আছে, খানিকটা জুড়িয়া নলখাগড়ার বন, বৈঁচি-কাঁটায় বাকী জায়গাটা আকীর্ণ। মরিলে তাঁহাকে যেন ওই চিতার পাশেই দাহ করা হয়, এমনি একটা বাসনা তিনি আগে হইতেই জানাইয়া রাখিয়াছেন।

এপাশে একটা বড় পুকুর প্রায় মজিয়া আসিয়াছে। কর্দমাক্ত জলের উপর ঘন জমাট শ্যাওলা ভাসিয়া বেড়ায়, নীল ফেনা হইতে দুর্গন্ধ উঠিয়া আসে, মশা-গুঞ্জিত পচা পাঁকের উপর যেন তেলের মতো কী একটা তরল জিনিস লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ওইখানে উঁচু পাড়ের

উপর, ওই যে কাঁটাওয়ালা শাদা রঙের একটা বেঁড়ে মাদার গাছ বাঁকা হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ওই গাছটার ডালে গলায় দড়ি দিয়া তাঁহার মেয়ে আত্মহত্যা করিয়াছিল। আফিমের নেশা যেদিন গাঢ় হইয়া আসে, নির্জন ভাঙা বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে অনাথ কবিরাজ দেখিতে পান, ওই ভাঙা চিতাটার পাশে, বাঁশ বনের আড়াল হইতে কে যেন উঠিয়া আসিল: ম্লান সন্ধ্যায় তাহাকে চিনিতে পারা গেল তাঁহার স্ত্রী বলিয়া। তারপর পুকুরের উঁচু পাড় ধরিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া আবার কে এদিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল, প্রদীপের আলোটা গিয়া তাহার মুখে পড়িল: সে স্বরো, হাঁ স্বরোই তো! মরিয়া তাহার মুখ যে ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, প্রত্যাসন্ন মাতৃত্বের ভারগ্রস্ত দেহ যেভাবে মাদারের ডালটাকে অনেকখানি বাঁকাইয়া নিয়া পুকুরের মধ্যে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, সে কুশ্রী বীভৎসতা এখন তাহার কোথায়! সেই আঠারো বৎসরের যুবতী সুশ্রী মেয়েটি শাদা একখানা থান কাপড় পরিয়া, রুক্ষ চুল এলাইয়া ঠিক তেম্‌নি ভাবেই আসিতেছে—দশ বছর আগে যেমন করিয়া সে আসিত।

অনাথ কবিরাজ ইহাদের দেখিতে পান—সন্ধ্যার অন্ধকারে ইহারা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। কী যে বলে, নেশা কাটিলে সে কথা তাঁহার আর মনে থাকে না। এই দেখার প্রলোভনেই অনাথ কবিরাজ এ বাড়ীটা এখনও ছাড়িতে পারেন নাই। লোকে তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, লোকের দুয়ারে কাঙালপনা করিয়া তিনি ঔষধ বিক্রি করিবার প্রয়াস পান। স্নেহ নাই, সহানুভূতি নাই, শুধু ধূসর সন্ধ্যায় তাঁহার ম্লান অবকাশকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া প্রেতমূর্তিরা নামিয়া আসে; এই মৃতের জগতের বাহিরে তিনি যাহাদের স্নেহ পাইয়াছিলেন, প্রফুল্ল তাহাদেরই একজন। বিনা প্রয়োজনেই সে তাঁহার কাছ হইতে কতবার ঔষধ কিনিয়াছে,

আট আনার জিনিস কিনিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়াছে; দয়া করিয়াছে, দান করিয়াছে। মরা-মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে যাহার আর কেহই নাই বললেই হয়, নিজের এই শেষ আশ্রয়টিকেও সে হারাইবে কী করিয়া?

সুতরাং তিনি একরকম ব্যস্তসমস্ত হইয়াই ছুটিয়া আসিলেন: ব্যাপারটা কী বলুন তো?

প্রফুল্ল বলিল, সবই জানতে পারবেন। একটা মিটিং করব আমরা, তা গবর্ণমেণ্ট আগে থেকেই আমাদের নিষেধ করে দিয়েছেন।

—তা হলে তো মিটিং হতে পারে না।

—সেই জন্যেই আরো মিটিং হবে। দু'চার জনকে জেলে যেতে হবে, মার খেতে হবে, তার জন্যে আমরা তৈরিই আছি।

—বলেন কী? বিবর্ণ মুখে অনাথ কবিরাজ কহিলেন, না, না, ও সব হতে পারে না। আপনি ও সমস্ত করতে পারবেন না, আপনাকে ছাড়তে পারি না আমরা।

এত প্রীতি, এত বন্ধন! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রফুল্ল বলিল, কিন্তু ছাড়তেই হবে যে কবিরাজ মশাই।

অনাথ কবিরাজ ম্লান হইয়া বলিলেন, কেন?

সাহেবপুরের মুসলমান সমাজ কিন্তু ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। লাঠি সোঁটা লইয়া তাহারা জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইল, মিটিং ভাঙিয়া দিবে। হিন্দুরা কিসের জন্য যে এ সব আন্দোলন করিতেছে তা কি তাহারা জানে না? কুমিল্লা হইতে সেদিন যে মৌলবী সাহেব আসিয়াছিলেন, তিনি কোরাণের বয়েৎ আওড়াইয়া তাহাদের বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে এ সমস্ত কেবল কাফের-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার মৎলব। তাহা

হইলে গো-কোরবাণী বন্ধ হইয়া যাইবে, মুসলমানদের ধর্ম থাকিবে না, মস্‌জিদগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়া হিন্দুরা সেখানে জিভ্‌ বাহির করা ভূতুড়ে কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে। যদি সাহেবপুরেরর মুসলমানদের দেহে একবিন্দুও ইসলামিক রক্ত থাকে, এবং যদি তাহারা ইরাণ-তুরাণের খাঁটি বংশধর হয়, তাহা হইলে এ হেন অনাচার তাহারা কখনোই ঘটিতে দিবে না।

জনতা চীৎকার করিয়া বলিল, কিছুতেই না।

সর্দার ইদ্রিস অগ্রসর হইয়া কহিল, লাঠির ঘায়ে আমরা সভা ভেঙে দেব। মৌলবী সাহেব বলে গেছেন, সরকার আমাদের পক্ষে। আর আমাদের কিসের ভয়?

সেই বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝখানে মুন্সী সাহেব আসিয়া দাঁড়াইল। যাচিয়া সে কোনও দিন আসে না; গ্রামের বা সাধারণের ভালোমন্দের ব্যাপারে কেহ কখনও তাহাকে এতটুকু অংশ লইতে দেখে নাই। সে ইহাদের বাহিরে নিজের চারিদিকে এমন একটা আভিজাত্যের সীমা-রেখা টানিয়া রাখিয়াছিল, যে মুসলমান সমাজ তাহাকে শুধু সম্মান করিত না, শ্রদ্ধাও করিত, সর্বোপরি কোরাণে তাহার অগাধ-পাণ্ডিত্য বিশ্রুত ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল।

মুন্সী সাহেব দাঁড়াইল, কিছু বলিবার জন্যই উঠিয়া দাঁড়াইল। বাতাসে তাহার চুলগুলি উড়িতেছে, শান্ত কঠিন স্বরে সে প্রশ্ন করিল, হিন্দুদের সঙ্গে বিরোধ করলেই ইসলাম নিরাপদ হবে, এ কথা কোথায় আছে?

ইদ্‌রিস বলিল, কোরাণে।

মুন্সী সাহেব কহিল, কোর্‌-আন্‌-শরিফ্‌ আম্‌পারা শরীয়ত আমার কণ্ঠস্থ। কোথায় আছে আমি সেটাই জানতে চাই।

উত্তর আসিল না।

মুন্সী সাহেবের উদাত্ত কণ্ঠ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; মানুষকে যারা মানুষের বিরুদ্ধে ভুল বোঝায়, অন্যের পরামর্শে যারা নিজেদের বুকে ছুরি মারতে চায়, আল্লা তাদের কোনোদিন দয়া করেন না। আমার এই কাটা হাতখানা তোমরা দেখেছ? যে শয়তানের বিষ নিঃশ্বাসে এ হাত আমার পুড়ে গিয়েছে, আমাদের রক্ত-মাংসেই সে তার ক্ষিদে মেটায়। তার সাপ-খেলান বাঁশীর সুরেই আমাদের মনের যত হিংসা আজ অন্যকে ছোবল মারবার জন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মনে রেখো, শয়তান শুধু আমাদেরই মাংসই খায় না, আমাদের আত্মাকে খাবার জন্যেও সে জিভ্ মেলে বসে আছে।

ইদ্রিসের মাথা নত হইয়া আসিল।

রাসমোহন শেষ বারের জন্য প্রফুল্লকে ডাকিলেন।

—কী অর্ডার এসেছে, শুনেছেন তো?

—শুনেছি।

—এর পরেও কি এ বিষয়ে আর বেশি এগিয়ে যাওয়া সঙ্গত মনে করেন?

প্রফুল্ল নিরুত্তরে শুধু হাসিল।

রাসু সেন কহিলেন, এর ফলে কী হবে তা বুঝতে পারছেন?

প্রফুল্ল মাথা নাড়িয়া বলিল, নিশ্চয়।

—তা হলে শেষবারের মতো এখনো ভেবে দেখুন। নিজেকে এ ভাবে কেন নষ্ট করে ফেলছেন? আপনি কত কাজ করতে পারেন, আপনাদের মতো ছেলে দেশের গৌরব। আর কেউ না জানলেও আমি সেক্রেটারী, আমি তো জানি, এই সামান্য তিন মাসের মধ্যেই আপনি কী অসম্ভব উন্নতি করেছেন ইস্কুলটার—

রাসু সেনের গলা কাঁপিতে লাগিল, তিনি সত্যি সত্যিই প্রফুল্লকে কি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন নাকি? কিন্তু প্রফুল্ল নির্বিকার।

শুধু কহিল, আমি চলে গেলেও সে উন্নতি আর থেমে দাঁড়াবে না, সে আশ্বাস আপনাকে দিয়ে গেলুম।

ওদিকে কিন্তু বিশ্রাম নাই নম্ভুর।

গ্রামের পর গ্রাম সে চষিয়া ফেলিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ ভাঙিয়া, খাল বিল নদী নালা ডিঙাইয়া, রৌদ্র বৃষ্টিতে ভিজিয়া সে মিটিংয়ের বন্দোবস্ত করিতে ছুটিল। বেশির ভাগই আসিতে রাজী হইলনা, সরকারী নিষেধ তখন তাহাদের সমস্ত উত্তোজনা-উদ্দীপনাকেই প্রশান্ত করিয়া দিয়াছে।

কেহ বলিল, দাদা ঠাকুর, ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি আমরা। ওসব কি আর আমাদের পোষায়?

নাস্তা চিবাইতে চিবাইতে আর একজন কহিল, স্বদেশী-টদেশী করা বড়লোকের কারবার, আমাদের নয়।

টোকা পরিয়া যে লোকটি ক্ষেতের মধ্যে দাঁড়াইয়া হুঁকা টানিতেছিল, সে বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করিল, তোমারা ঘরে বসে খাবে দাবে, দু' দিন সখ করে জেল থেকে ঘুরে আসবে। আমরা গেলুম তো গুষ্টিশুদ্ধই গেল।

মাণিক ভূঁইমালীর দল খেজুর গাছ চাঁছা হাসুয়া শাসাইয়া কহিল, ও সমস্ত মতলব আমাদের দিতে এসোনা বাবুরা। জমিদারের রাজত্বে আমরা বাস করি, ভিটে মাটি উচ্ছেদ করে দিলে তোমরা তখন দেখতে আসবে?

কেরায়া নৌকার মাঝিরা তো লগি তুলিয়া মারিতেই আসিল।

—যাও যাও বাবু, সরে পড়ো। তোমাদের আর কি, শেষকালে মরতে মরি আমরাই। ভদ্রলোকদের কি বিশ্বাস করতে আছে?

অবশেষে ইস্কুলের মাঠেই সভার সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

সভাপতি হইলেন নরেশ কর। এতদিন ধরিয়া আয়োজন বৃথা হয় নাই, এক দুই করিয়া ক্রমে ক্রমে লোক জমিতে লাগিল। শেষে সত্যি সত্যিই ভিড় জমিল। অন্তরের প্রেরণায় কয়জন আসিয়াছিল কে জানে, কিন্তু কৌতূহল কাহারোই কম ছিল না। উঁকি মারিতে আসিয়া শেষ পর্যন্ত দর্শকই দাঁড়াইয়া গেল অনেকে।

সুরেন মজুমদার আসিলেন না, রাসু সেন আসিলেন না, রামকমল আসিলেন না, ইস্কুল কমিটির সদস্যেরা কেউই আসিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু অনাথ কবিরাজ আসিলেন। এ সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো পরিস্ফুট ধারণাই তাহার নাই, তবু তিনি কেন যে কিসের টানে আসিলেন, সে কথা শুধু তিনি নিজেই বলিতে পারিতেন।

নরেশ কর বক্তৃতা দিতে উঠিলেন। একবার গোঁফজোড়া চুমরাইলেন, কাঁধের চাদরটা ঠিক করিয়া লইলেন, কল্পনা করিলেন তাঁহার সামনে মাইক্রোফোন এবং শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বিপুল জনতা।

গলা খাঁকারি দিয়া নরেশ কর আরম্ভ করিলেন:

কবি বলেছেন—সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী

রেখেছ বাঙালী ক'রে—

কিন্তু অর্ধপথেই বক্তৃতা তাঁহার থামিয়া গেল।

শিববাড়ীর নীচে দুখানা বড় নৌকা আসিয়া ভিড়িয়াছে,—আট দশ মাইল দূরের থানা হইতে আসিয়াছে পুলিশের নৌকা। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। খবর পাইয়া সুরেন মজুমদার এবং রামকমল কোথা হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিলেন।

—হেঁ-হেঁ—একটু চা?—সুরেন মজুমদার জানিতে চাহিলেন। ইন্‌সপেক্টর পকেট হইতে গোল্ডফ্লেক্ সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইলেন,

কহিলেন, চা পরে হবে, আগে অ্যারেস্ট-ফ্যারেস্ট সেরে শেষে অন্য কথা। মিটিং কোথায় হচ্ছে?

—মিটিং হচ্ছে ইস্কুলের মাঠে, চলুন—রামকমল পুলিশবাহিনীকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি আসিয়াছেন অভ্যর্থনা করিতে, ইন্‌সপেক্টর তাঁহাকে একটা সিগারেট না দিয়া পারিলেন না। সুরেন মজুমদার সিগারেটটা হাতে লইয়া একবার গর্বিতভাবে চারিদিকে তাকাইলেন শুধু। তাঁহার মূল্য ইহারা বুঝুক। হাতী মরিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও লাখ টাকা।

নরেশ কর খবরটা পাইয়াছিলেন। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার বেগটা হঠাৎ সংযত করিয়া লইয়া তিনি কহিলেন, বন্ধুগণ, আমি ভয়ঙ্কর অসুস্থ বোধ করছি, আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিদায় নিতে হল, কিছু মনে করবেন না।

নরেশ কর নামিয়া গেলেন।

প্রফুল্ল 'ডায়াসে' আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় তাহার খদ্দরের টুপি, তাহার দীর্ঘদেহ স্থির-সংকল্পে দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার চোখের সেই দীপ্তি আরো তীব্র, আরো উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

জনতা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিল। নন্তু কী একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, বজ্র-কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি গগন-পবনময় ছড়াইয়া গেল।

ঠিক এমনি সময়েই ইন্‌সপেক্টর তাঁহার পুলিশ বাহিনী লইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। মুহূর্তে যেন যাদুমন্ত্রের স্পর্শে ভিড় ভাঙিয়া পড়িল, তারপর একটা দম্‌কা বাতাসের অপেক্ষা মাত্র।

ঝড় আসিল।

ঝড় আসিল এবং বহিয়া গেল। ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাওয়াটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যে অনিবার্য পরিণতির জন্য ইহারা অপেক্ষা করিতেছিল,

সেই পরিণতির আবির্ভাবে কেহ দুঃখিত হইল কি-না কে জানে, কিন্তু বিস্মিত হইল না। যাহারা আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইতে চাহিয়াছিল, জীবনের সূর্যোদয় সম্ভাবনায় যাহারা বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহারা তিরোহিত হইল অন্ধকারের পটভূমিকায়। তাহাদের কণ্ঠ কতদিনের জন্য, অথবা চিরদিনের জন্যই অবরুদ্ধ হইয়া গেল কি-না কে বলিবে?

তপন দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিল, Fools, they are all fools!

একটু আগেই তপনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, মনের দিক হইতে শুক্লা একটা প্রশান্তি বোধ করিতেছিল। বাহিরের এই ঝড়ে সে বিশেষ বিচলিত হয় নাই, কলিকাতার পথেঘাটে এ দৃশ্য দেখা তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নিজের চোখের সামনেই লাঠির আঘাতে এমন বহু ছেলেকে সে রক্ত দিতে দেখিয়াছে। কিন্তু শুক্লা নাগরিক—সে ভাবপ্রবণ নয়, বুদ্ধিবাদের আশ্রয়ে সে বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের সে কতখানি মূল্য দেয় কে জানে, কিন্তু বিচলিত হয় না।

জিজ্ঞাসা করিল, কেন, ওরা fool হতে গেল কিসের জন্যে?

—কারণ ওরা যা করল তার মূল্য কে বুঝবে? এরা অন্ধকারের জীব, এরা যক্ষ্মারোগী। এদের বাঁচিয়ে কী হবে—মরুক; মরুক—সব মরে শেষ হয়ে যাক। অনেক ভেবে এইটেই আমি বুঝেছি যে পৃথিবীতে Neroরই জয় জয়কার। If I could turn a second Nero!

নাঃ, আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তপন। অদ্ভুত খেয়ালী মানুষ যা-হোক। কিসে যে ক্ষেপিয়া উঠিবে অনুমান করা দুঃসাধ্য।

কিন্তু বাইরের এই সামান্য ব্যাপারটা লইয়া এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করিতে ইচ্ছা হইতেছে না শুক্লার।

সুন্দর সন্ধ্যাটা কেনই বা নষ্ট হইবে! তপন কবি, তপন ভাবপ্রবণ। একথা তাহার বেশিক্ষণ মনে থাকিবে না। শুক্লার রূপ আছে, তপনের দেহে মনে রূপতৃষ্ণা কাঁদিয়া মরিতেছে। এইটাই তো আর তপনের একমাত্র পরিচয় নয়! একটু পরেই হয়তো সে প্যালিয়োলিথিক ম্যান লইয়া কবিতা লিখিতে সুরু করিবে, নয়তো ব্রাউনিং খুলিয়া বিদ্রোহী প্রেমের কবিতা পড়িতে বসিবে।

তপন কবি—তপন খেয়ালী।

গ্রামের উপর ধূসর সন্ধ্যা নামিয়াছে। চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়। মুকুল পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছে, চুলগুলির মধ্যে তাহার আঙুল চলিতেছে। তাহার চোখ জ্বলিতেছে। কত কাজ—কত বড় কর্তব্য! সমস্ত জীবন দিয়াই এ ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হইবে, কোন সংশয়-সঙ্কটেই থামিলে চলিবে না। নীলিমার ঘরে বাতি জ্বলিতেছে না, ঘরে খিল্ দিয়া সে যে কী করিতেছে কে জানে। মধু মণ্ডলের বাড়ীর আনাচ-কানাচে টোনা শিস দিয়া ফিরিতেছে, শশিকান্ত ভাবিতেছে, মধু মণ্ডল একবার সদর হইতে আসিলেই হয়। রাসু সেনের সামনে গড়গড়াটা পুড়িয়া চলিয়াছে, শূন্য দৃষ্টি অন্ধকারের দিকে প্রসারিত করিয়া তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছেন। দাওয়ায় বসিয়া অনাথ কবিরাজ ঝিমাইতেছেন, সময় হইয়া আসিল, সময় হইয়া আসিল: মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এখন চারিদিকের প্রেতাত্মারা সারা দিনের প্রগাঢ় ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিবে, তাহাদের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নলবনের মধ্যে দপ করিয়া একটা আলেয়া জ্বলিতে থাকিবে বুঝি।

ওদিকে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে আড়িয়ল খাঁর জলে দাঁড় টানিয়া

বেবাজিয়াদের নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে নিরুদ্দেশের পথে। চিরন্তন যাযাবর ইহারা, কোথাও দাঁড়াইবার সময় ইহাদের নাই। কালীপদের দেশী বনের দোকানের সামনে নেশায় চুরচুরে হইয়া মাণিক ভূঁইমালীর দল গড়াগড়ি দিতেছে, কোথা হইতে একটা কুকুর আসিয়া মুখ চাটিতেছে তাহাদের। মত্ততার একটা চরম পর্যায়ে আসিয়া মানুষ ও পশুর মধ্যবর্তী সমস্ত ব্যবধানই নিঃশেষে লোপ পাইয়া গিয়াছে। কাউণ্টারের সামনে কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া কালীপদ হিসাব দেখিতেছে, তিন গ্যালন মদ বেশি বিক্রি হইয়াছে এ হাটে। এমন করিয়া বিক্রি বাড়িতে থাকিলে এ বৎসর পূজোর সময়েই ঘরের ভিটেটা পাকা করিয়া ফেলা সম্ভব হইবে। গণু মিঞার বৈঠকখানায় মদ ও মাংসের আসর বসিয়াছে, দুই এক পাত্র পেটে পড়িতে না পড়িতেই রামকমলের মুখ খুলিয়া গিয়াছে। ইনাইয়া বিনাইয়া রসাইয়া রসাইয়া তিনি দারোগা জীবনের কোনো এক অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন হয়তো। মশার গুঞ্জনে এবং পচা পাটের দুর্গন্ধে পল্লীর বায়ুস্তর ভীত—বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে ; খালে বিলে কচুরির গভীর আবরণ যেন অজস্র মুখ মেলিয়া পৃথিবীর প্রাণরস শুষিয়া লইতেছে ; দরিদ্র কুটিরের ভাঙা বেড়ার আড়ালে সদ্যোজাত শিশুকে মায়ের বুক হইতে চুরি করিয়া লইবার সুযোগ খুঁজিয়া শেয়ালের দল আনাগোনা করিতেছে। পাট ক্ষেতের নিবিড় দুর্ভেদ্যতা হইতে নর-পশু-কবলিত মাতৃজাতির চাপা আর্তনাদ সকরুণ ব্যর্থতায় অভিশাপের মতো আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে।...

ধারা কি এমনিই চলিবে,—অনন্তকাল ধরিয়া, যুগ-যুগ, কাল-মহাকাল ধরিয়া ? ঝড়ের যে ডঙ্কা বাজিল, তাহার আহ্বানে কোথাও কি সাড়া জাগিল না ? মানুষ এতকাল ধরিয়া সুন্দরের যে তপস্যা করিয়াছে,

এমনি করিয়াই কি তাহা চিরন্তনের চক্রাবর্তে বিলীন হইয়া যাইবে ?

সাহেবপুর ঘাট হইতে স্টিমার ছাড়িল। একদা প্রভাতে প্রফুল্ল এখানে আসিয়া নামিয়াছিল, আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে এখান হইতে বিদায় লইল। তবে এবারে সে আর শুধু একা নয়, সঙ্গী অনেকেই। নন্তু, পাড়ার কয়েকটি ছেলে এবং পুলিশের সতর্ক প্রহরা। তাহাদের সদরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। এখানকার থানায় একসঙ্গে এতগুলি মানুষকে আটকাইয়া রাখিবার জায়গা নাই।

ইন্‌সপেক্টারটী সত্যিই ভালো লোক। সিগারেট টানিতে টানিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চায়ের ব্যবস্থা করব আপনাদের ?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, ধন্যবাদ। পেলে তো ভালোই হয়।

একজন কনেস্টবলকে ডাকিয়া চায়ের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া ইন্‌সপেক্টার সেকেণ্ড ক্লাশের ডেকে চলিয়া আসিলেন। তারপর একখানা ডেক্ চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া পকেট হইতে একখণ্ড সচিত্র 'নাইট ইন্ প্যারিস্' পত্রিকা বাহির করিলেন। ছবিগুলি যেমন সরেস, গল্পগুলিও। হাঁতে সিগারেট পুড়িতে লাগিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ইন্‌সপেক্টার নগ্ন চিত্র এবং নগ্নতর গল্পগুলির মধ্যে ডুবিয়া গেলেন।

...আড়িয়ল খাঁর কালো জল কল্‌কল্ করিয়া বাজিতেছে, ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় ফেনায়িত তরলতা গজরাইয়া উঠিতেছে, তীর ক্রমশ ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের ম্লান অন্ধকার। সাহেবপুর হাটের এলোমেলো সুপারিবন বাতাসে দুলিতেছে, মনে হইতেছে হাত বাড়াইয়া রক্তবিন্দুর মতো অসংখ্য তারা—ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে তাহারা ভাঙিয়া পড়িতেছে।

নন্তু প্রফুল্লের পাশেই বসিয়াছিল। মাথায় তাহার রক্তে ছোপানো

একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ইন্‌সপেক্টর চলিয়া যাইতেই অগ্নিগর্ভস্বরে কহিল, এখন সব বুঝলেন তো? রবি দা স্পাই, ও-ই ব্যাপারটা ঘটিয়ে তুলেছে। কী ভয়ানক লোক! একবার যদি ছাড়া পাই—

নিজের মনেই নস্ত শৃঙ্খলিত হাত দুখানা মুষ্টিবদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল তাহার কথার উত্তর দিল না। কাহারো উপর রাগ নাই, অভিমান নাই, অভিযোগ নাই একবিন্দু। ক্লান্ত প্রশান্তি সমস্ত মনটাকে অলস করিয়া দিয়াছে। অনেক দূরে—যেখানে অন্ধকারের মধ্যে প্রায় মিলাইয়া আসা তীর-তটের গায়ে আড়িয়ল খাঁর জল আছড়াইয়া পড়িতেছে, সুপারি-নারিকেলের বীথিতে বাতাসের মর্মর বাজিতেছে এবং নির্জন চড়ার গায়ে একলা দাঁড়াইয়া থাকা মুন্সী সাহেবের শাদা জামাটা বাতাসে উড়িতেছে, সেদিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ মেলিয়া সে আর এক পৃথিবীর স্বপ্নই দেখিতেছিল হয় তো।